রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি

এম.ফিল. আতসন্দর্ভ

M.Phil.

অরূপ কুমার বড়ুয়া

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
891.442
BAR
2

Dhaka University Institutional Repository

400460

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি

400460

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি

(এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ)

গবেষক অরূপ কুমার বড়ুয়া

(নিবন্ধন সংখ্যা : ৭০/৯০-৯১)

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগের এম.ফিল. গবেষক অরূপ কুমার বড়ুয়া (নিবন্ধন সংখ্যা-৭০/৯০-৯১) আমার তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি' বিষয়ে এম. ফিল. উপাধির জন্যে গবেষণা সমাপ্ত করে বর্তমান অভিসন্দর্ভ পেশ করছে। সে তার নিজস্ব মেধা, অধ্যয়ন ও শ্রমের মাধ্যমে এই গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা এবং এর পুরো বা কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয় নি অথবা কোন উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কোন উপাধির জন্যে উপস্থাপিত হয় নি।

(মোহাম্মদ আবু জাফর) 29/5/02

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা		৭
২.	প্রথম অধ্যায়	শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতি : আন্তঃসম্পর্ক	১০
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকে রাজনীতি	২২
৪.	তৃতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্র-নাটকে রাজনীতি	৩৯
৫.	চতুর্থ অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি	৮২
৬.	পঞ্চম অধ্যায়	উপসংহার	১৭৩
৭.	গ্রন্থপঞ্জী		১৮২

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি সম্পর্কে আমার গবেষণা করার উৎসাহ বর্তমান এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পেল। এ জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ।

আমার শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফরের সার্বক্ষণিক মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হতো না। তাঁর কাছে এ জন্যে আমি গভীরভাবে ঋণী। আমার গবেষণার সূচনাপর্বে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সনজীদা খাতুন এবং প্রথম পর্বের কোর্স শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপক আহমদ কবির নানা নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে এবং বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান, এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যথারীতি সহায়তা দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন । এ জন্যে তাঁদের সবাইকে নিবেদন করি আমার গভীর শ্রদ্ধা ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার শিক্ষক জনাব গোলাম মুস্তাফা তাঁদের সংগৃহীত কিছু বই পড়ার সুযোগ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রভাষক কুন্তল বড়ুয়া এবং আমার অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী বই, পত্র-পত্রিকা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সব সময় উৎসাহিত করেছেন । এ জন্যে তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ।

গবেষণা-কাজে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কমলাপুর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মইজ উদ্দিন খান এবং শাখা অফিসার শ্রী রতন কুমার দাস এবং কল্যাণ ট্রাস্টের বার্তাবহ শ্রী সুদত্ত বড়ুয়ার আন্তরিক সাহায্য আমার

Dhaka University Institutional Repository

বহু কাজ সহজ করে দিয়েছে। তাঁদের এবং উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকার সময় আমার বাবা-মা, স্ত্রী-কন্যা,ভাই ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় সংসার বিষয়ে আমার অনিবার্য উদাসীনতা সহনশীলতার সঙ্গে অনুমোদন করে আমাকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন । তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে অনুজপ্রতিম সতীর্থ গবেষক মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহমদের সাহচর্য ও সহযোগিতা ভুলবার নয়। কম্পিউটার চালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং জনাব আকবর হোসেনের কার্যকর সহযোগিতা পাণ্ডুলিপি সুষ্ঠুভাবে তৈরী সহজতর করেছে। এ জন্যে তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। বাংলা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী জনাব আবদুল ওয়ারেস মিয়া এবং দুই বার্তাবহ সর্বজনাব মোঃ সাইদুর রহমান এবং মোঃ মিজানুর রহমান বিভিন্ন সময় আমাকে যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি ।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি রবীন্দ্র-নাট্য মূল্যায়নে সামান্যতম অবদান রাখতে পারলেও আমার পরিশ্রম সফল বলে গণ্য করবো।

ঢাকা ২৯.৬.২০০২ অরূপ কুমার বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর অবদান অসামান্য। নাটকও তার বাইরে নয়। তাঁর আবির্ভাবকালে নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে বাংলা নাটক জনপ্রিয়তা পেলেও শিল্পমানের দিক থেকে শীর্ষে পৌঁছাতে পারে নি। এ অবস্থায় তিনি বাংলা নাটককে বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হন। বিষয় গৌরবে, সংলাপের প্রাঞ্জলতায় ও ক্ষেত্রবিশেষে ভাষার কাব্যময়তায় এবং কখনও কখনও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তিনি অর্জন করেন বিশিষ্টতা। তিনি প্রথাগত পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখেছেন, লিখেছেন একাঙ্ক, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য। একই সঙ্গে ব্যাপৃত থেকেছেন নাট্য আঙ্গিকের নিরীক্ষায়। তবে তিনি যে ছিলেন মূলত একজন কবি ও দার্শনিক তা তাঁর সৃষ্টির সবখানেই লক্ষ্যযোগ্য। প্রধানত এ কারণেই তিনি আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন তত্ত্ব নাটক বা রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনায়। এই শ্রেণীর নাট্যকর্মগুলোর মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ও ভাবসমৃদ্ধ মানসের যেন যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেন উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা। তিনি যে পূর্বাপর মানবতাবাদী তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ক্ষেত্রটিতে। সঙ্গত কারণেই, রবীন্দ্রনাথের নাট্য রচনায় বিধৃত রাজনীতিচিত্র জানতে হলে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশি।

রবীন্দ্রযুগে ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে অব্যাহত ছিল বিচিত্রমুখী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূচিত হয় আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম । একই সঙ্গে যন্ত্রের মানবতাবিরোধী ব্যবহারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হচ্ছিল অসংখ্য সচেতন মানুষ। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে একটি প্রলয়ংকরী বিশ্বযুদ্ধ এবং বৃটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের গণ্ডি পেরিয়ে এসেও এদেশের মানুষের জীবনে স্থিরতা আসেনি। নব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় দোসর শ্রেণীর শোষণের জাঁতাকলে আরও নিষ্পেষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তীব্র শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে আরেকটি সংগ্রাম তথা বিপ্লব। এই রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামের অনিবার্যতার কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মসমূহে মেলে কি না তা জানার কৌতূহলও স্বাভাবিক। তাঁর নাটকে সমকালীন জীবনের ছবি তিনি আঁকবেন, এটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কালোত্তীর্ণ শিল্পীও। এ কারণে তাঁর রচনায় ভবিষ্যতের জীবন তথা রাজনীতির ইঙ্গিত আশা করাটা অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাটকের বিষয় ও আঙ্গিক কতখানি শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলো রবীন্দ্র নাট্যের বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল দিক উন্মোচনে সহায়ক। কিন্ত আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় এখনও ব্যাপক আলোচনা হয় নি। সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'রবীন্দ্র-মানস' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তা রবীন্দ্র-মানসের গভীরে আলো ফেললেও সামগ্রিকতা সন্ধানী নয়। অপর দিকে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধী প্রধান এবং প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা করেছেন। এঁদের প্রথম দুজন বস্তুবাদী সমালোচনার নামে যা উপস্থাপন করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের বক্তব্য প্রচারক বলে ধারণা জন্মে । অপর পক্ষে প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য তত্ত্বনাটক সম্পর্কে কিছু চর্কিত-মন্তব্য করেছেন। ফলে তাঁর প্রবন্ধটি সমগ্রতাস্পর্শী হতে পারে নি। সমালোচনার দ্বান্দ্বিকতাও তাতে অনুপস্থিত বলে তাঁর আলোচনা খণ্ডিত। এ ধরনের সীমাবদ্ধ এবং বস্তুবাদী সমালোচনার অভাব আমাদের এ কাজে ব্রতী হতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর সূত্র সম্পর্কে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা নাটকে রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনা। এতে তৎকালীন নাটকে রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যকর্মে রাজনীতির প্রতিফলন বিষয়ে আলোচনা। চতুর্থ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোতে উপস্থাপিত রাজনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংশ্লিষ্ট নাটকগুলো বিশ্লেষণকালে প্রথমে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক সময় সমসাময়িক রাজনীতি নাটকের মূল ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে স্থান পায় নি। ফলে এমন ধারণা করা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক রচনা করেন নি। তবে কোন কোন নাটকে তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশও লক্ষ্য করা গেছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে পরোক্ষভাবে। এ সব উদঘাটন সম্ভব তাঁর নাটকে ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের গভীরে অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপের মাধ্যমে।

রবীন্দ্র-নাটকের শিল্পমান বিচার এ অভিসন্দর্ভের প্রধান লক্ষ্য না হলেও কখনও কখনও সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রতিফলিত রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত সর্বদা প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের মতের অনুগামী হয় নি। তবে সে ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব নাটকের সংলাপ, বিভিন্ন সময় দেওয়া কবির বক্তব্য, সাক্ষাৎকার এবং তাঁর অন্যান্য রচনার সাহায্যে গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার একটি সার-সংক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতি : আন্তঃসম্পর্ক

নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সমাজে মানব জীবন উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ভর। এই উৎপাদন-সম্পর্ক-নির্ণীত সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিন্যাস মানব জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তির সমন্বয়ে। তাই সমাজ গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির ভূমিকাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। এবং সেই নিরিখে, উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টিতে ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির এবং একই সঙ্গে সমষ্টির তথা সমাজের কার্যকর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ সব কারণে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় অনস্বীকার্য।

শ্রেণীবিভক্ত কোন সমাজই স্থির বা অনড় নয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিয়মে প্রতিটি সমাজ-অভ্যন্তরে থাকে স্থিতি ও পরিবর্তনকামী শক্তির দ্বন্দ্ব, সুবিধাভোগী ও নির্যাতিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব, বা শ্রেণীসংগ্রামে বিজয়ী শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ-ব্যবস্থা। এ ভাবে এক সমাজ-কাঠামো নিরবচ্ছিন্নভাবে অপর সমাজ-কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের এ ধারায় আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে এসেছে দাস-প্রভুভিত্তিক সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজ। মার্কস-এঙ্গেলস এ জন্যেই বলেছেন :

> The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.[১]

এবং সেই সংগ্রামে সামাজিক মানুষ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাঁর শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক মানুষই অবস্থান করে হয় সুবিধাভোগী শ্রেণীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণীতে। সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাই কেউ নিরপেক্ষ বা মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারে না। নিরপেক্ষ আর সোনার পাথরবাটি একই কথা।

১.Marx-Engels. Manifesto of the Communist Party. Selected Works. Progress Publishers. Moscow. 1970. p.35 ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিন্যস্ত থাকে অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে।[২] সমাজের এই মৌল কাঠামো (Basic structure) নির্ভরশীল উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের সম্পর্কের ওপর। নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সৃষ্টি করে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি। এ সব মিলে গঠিত হয় যে উপরি-কাঠামো (Superstructure) তার কাজ হলো সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের যারা মালিক, তাদের ক্ষমতাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (Institution), যেমন আইন ও শাসনব্যবস্থা, দ্বারা সুরক্ষিত রাখা। স্বাভাবিকভাবে এ উদ্দেশ্যে সমাজে নৈতিক, ধর্মীয়, নন্দনতাত্ত্বিক প্রভৃতি মতাদর্শও গঠিত হয়।

কার্ল মার্কস তাঁর A contribution to the Critique of Political Economy গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে বলেন :

> In the social production of their life men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will. relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society. the real foundation. on which rises a legal and political superstructure and to which

---

২.'The building like metaphor of base and superstructure is used by Marx and Engels to propound the idea that the economic structure of society (the base) conditions the existence and forms of the STATE and social consciousness (the superstructure).'

A Dictionary of MARXIST THOUGHT, Ed. Tom Bottomore. Blackwell Reference. 1983. p.42।

Dhaka University Institutional Repository

correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness. [৩]

শিল্প-সাহিত্য সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বিশেষ করে সাহিত্যে সমাজ উদ্ভাবিত ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বলে কোন কোন সাহিত্যতাত্ত্বিক সাহিত্যকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। [৪] সেই শিল্প-সাহিত্য কিংবা নন্দনতত্ত্বও সমাজের উপরি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যা সামাজিক মতাদর্শ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জি.ভি. প্লেখানভের ভাষায় :

> একটি যুগের সামাজিক মানসিকতা সেই যুগের সামাজিক সম্পর্কসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একথা যেমন স্পষ্ট, তেমন আর কোথাও নয়।[৫]

সামাজিক অবকাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হলে উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানেও পরিবর্তন আসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হতে পারে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্পর্কের

৩.Marx, Karl, 'Preface to A contributions to the critique of Political Economy;Marx-Engels, selected works Vol.1, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1962, pp.362-363 ।

৪. 'Literature is a social institution, using as its medium language, a social creation. Such traditional literary devices as symbolism and metre are social in their very nature.' Wellek, Rene and Warren, Austin, Theory of Literature, London, 1963, p.94।

৫. উদ্ধৃত, টেরী ঈগলটন, মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা (ভাষান্তর: নিরঞ্জন গোস্বামী), কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ.১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি। দাস যুগে রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতো। সামন্ত যুগেও রাষ্ট্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিল ধর্মীয় পীঠস্থানসমূহ। অথচ পুঁজিবাদী যুগে রাষ্ট্র-ব্যাপারে ধর্মের সেই ক্ষমতা আর থাকলো না। ধর্ম অনেকখানি পরিণত হলো জনগণের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে। অবশ্য মূল্যবোধের বা উপরি-কাঠামোর এই পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে পারে না ; এর জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য উপাদানের মতো সামাজিক অবকাঠামো বদলের সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন আসে। যেমন, প্রাচীন দাস ও সামন্ত সমাজ-চৈতন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডেসির মতো মহাকাব্য। সামন্ত সমাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে আছে রোমান্সমূলক কাব্য। আর সামন্ত সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তিত হওয়ার সময় নিয়ে এলো গদ্য ও উপন্যাস। [৬] তবে সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন এবং সাহিত্য-আঙ্গিকের বিকাশ সর্বদা সরলরৈখিক বা যান্ত্রিক নয়। সাধারণত, সমাজ চৈতন্যের মননশীল সৃষ্টি হিসেবে সাহিত্য এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাহিত্য শুধু অবকাঠামো থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে না; ধর্ম দর্শন ইতিহাস পুরাণ কিংবদন্তি প্রভৃতি থেকেও আসে সাহিত্যের বিষয়। যথার্থ মহৎ সাহিত্য নির্দিষ্ট যুগের সৃষ্টি হয়েও যুগান্তরের পাঠককে আকৃষ্ট করে। যেমন, শেক্সপীয়র ও ফেরদৌসী সামন্ত সমাজের পটভূমিতে সাহিত্যচর্চা করলেও তাঁদের নাটক ও মহাকাব্য আদৃত হয়েছে পরবর্তী কালেও। কারণ, শেষ বিচারে মানুষ ও তার মন পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করে না । ফলে একজন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি কিভাবে প্রকাশ করতে চান সেটি তাঁর নিজস্ব অভিরুচি। একই সঙ্গে স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক সমাজ-কাঠামোতে অবস্থান করে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকসমূহে বরাবর সামন্ত সমাজকে অবলম্বন করেছেন। তবু, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি আজও কালোত্তীর্ণ শিল্পী হিসেবেই গণ্য। মূলত, সাহিত্যের এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সংস্কৃত ও গ্রিক মহাকাব্য, কালিদাস কিংবা ইস্কিলাস-সফোক্লিস-এ্যারিস্টোফেনিসের নাটক আজও আমাদের আগ্রহের বস্তু।

এ দিকে সামন্ত সমাজ থেকে বিবর্তিত হওয়া পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব হয়ে

৬.সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা,ঢাকা, ১৯৮৫,পৃ.৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে ব্যাপক ও তীব্র। মুনাফার দুর্দমনীয় লোভে এই পুঁজিবাদ সমস্ত কিছুকে পণ্যে পরিণত করে। মানুষ সেখানে হয়ে যায় পণ্যমাত্র, মানবতা বাঁধা পড়ে শোষণের জালে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ঐকান্তিক কামনায় কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুসারীরা আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে,

> The major classes are most clearly differentiated, class consciousness most fully developed, and class conflict most acute, in capitalist society, which constitutes in these respects a culminating point in the historical evolution of class divided forms of society. From this perspective modern class struggles have a central importance in Marxist theory, because their outcome is conceived as a transition to socialism; that is to classless society.[৭]

সেই শ্রেণীহীন সমাজে শোষণ থাকবে না, থাকবে না মানবতা লাঞ্ছনার কোন ব্যবস্থা। মানুষ হবে যথার্থ স্বাধীন, তার বিকাশ হবে বাধাহীন। সমাজের নেতৃত্বে থাকবে প্রলেতারীয় বা শ্রমজীবী শ্রেণী। কিন্তু বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষকেরা অনায়াসে তা হতে দিতে পারে না।[৮] শ্রমজীবী শ্রেণীকে তাই সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মার্কসবাদীদের মতে, এটাই বুর্জোয়া সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।[৯]

---

৭. A Dictionary of Marxist Thought, Ibid, p.78।

৮. ' উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে চায়। অপর দিকে শ্রমিক শ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।' এ. এফ. এম. ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯৩, পৃ.১৮৯।

৯.'প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পত্তি-মালিক এবং দাস, ভূমিদাস অথবা সর্বহারার মধ্যে অব্যাহত থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদের যুগে এই সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে সমাজ-অভ্যন্তরের শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যে শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে দার্শনিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক অবয়ব গঠন করে এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের যৌক্তিক সমাপ্তি ঘটায়। এ প্রসঙ্গে স্ট্যালিন বলেছেন :

> সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় বলিয়াই নতুন সামাজিক ধারণা ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটে ; তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী শক্তি বিনা সমাজের বাস্তব জীবন বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন অসম্ভব বলিয়াই তাহাদের আবির্ভাব ঘটে ; সমাজের বাস্তব জীবন বিকাশ সম্পর্কে কাজের তাগিদে দেখা দিয়া নতুন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ সকল বাধা সবলে দূর করিয়া অগ্রসর হয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে , এবং যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, সেইসব শক্তিকে পরাভূত করার কাজকে সহজ করে।[১০]

সমাজের মননশীল স্রষ্টা হিসেবে শিল্পী-সাহিত্যিকরা উল্লিখিত পরিবর্তনমুখী সমাজ-চৈতন্যের প্রতিফলন যেমন ঘটাতে পারেন, তেমনি পশ্চাৎপদ মতাদর্শও প্রকাশ করতে সক্ষম। মতাদর্শহীন সৃষ্টি বলে কিছু নেই। সাধারণভাবে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁর শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তা প্রচার করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও শৈল্পিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে কিংবা নিজের বিবেকতাড়িত মতামত প্রকাশের ঐকান্তিকতায় শিল্পীরা অনেক সময় তাঁদের শ্রেণী, ঐতিহ্য-লালিত দর্শন এমনকি কালগত অবস্থানও পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন। কারণ, সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল সত্তার অংশ হিসেবে নিপীড়িত মানবতার আকুতি তাঁরা উপলব্ধি করেন এবং সৃজ্যমান শিল্পকর্মে তা রূপ দেন। শিল্পীমাত্রই স্পর্শকাতর মনের অধিকারী, সমসাময়িক

পরিগ্রহ করে এমন এক রাজনৈতিক চরিত্র যার লক্ষ্য হলো দাসত্বের বন্ধন থেকে শ্রমজীবী জনগণের সার্বিক মুক্তি,ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং যে শ্রেণী সম্পত্তিকে ভালোবাসে কিন্তু সম্পত্তির স্রষ্টা শ্রমজীবী জনগণকে ঘৃণা করে সেই শ্রেণীর পরিপূর্ণ উচ্ছেদ।'বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.৩০ ।

১০.সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক)পার্টির ইতিহাস,কলকাতা,১৯৯৭, পৃ.১১১।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তাই শিল্পী-সাহিত্যিকরা এড়িয়ে যেতে পারেন না । যে কোন একটি পক্ষ তাঁকে অবলম্বন করতেই হয়–সচেতনভাবে হোক,আর অসচেতনভাবেই হোক । ফলে শিল্পস্রষ্টার শ্রেণী অবস্থান যা-ই হোক না কেন, শিল্পগুণের পাশাপাশি বক্তব্যের প্রগতিমুখীনতার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বস্তুবাদী রাজনীতির সমর্থকে পরিণত হন। এ সব কারণেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অভিজাততন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক হয়েও ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার বালজাক এঙ্গেলস-এর শ্রদ্ধা অর্জন করেন ।[১১] অথচ, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণীর জন্য শিল্পগুণহীন উপন্যাস রচয়িতা মিন্না কাউৎস্কি এঙ্গেলস-এর পূর্ণ প্রশংসালাভে ব্যর্থ হন। [১২] তেমনি রুশ ঔপন্যাসিক তলস্তয়কে লেনিন 'একজন খৃস্টভক্ত ভূ-স্বামী' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন :

> The great artist, the genius who has not only drawn incomparable pictures of Russian life but has made first-class contributions to world literature. [১৩]

এ ভাবে মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকরা অনেক সময় নিজের অজান্তেই নিপীড়িত মানুষের জন্যে নতুন সমাজ গড়ার অনুকূলে অবদান রাখেন।

সমাজ বিকাশের কোন কোন পর্যায়ে এমন সময় আসে যখন শিল্পী-সাহিত্যিক সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী শিল্প সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ হন। জনগণকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কিংবা বিপ্লবীদের মনোবল দৃঢ় করার উৎসাহ দিতে তাঁরা হন উদগ্রীব। তেমন অবস্থা এসেছিল রাশিয়ায় (বিপ্লবের আগে ও পরে), চীনে, ভিয়েতনামে ; এমন কি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেও । শিল্প-সাহিত্য তখন অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিল সংগ্রামের হাতিয়ার। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির প্রভাব ও এলাকা যে ভাবে বিস্তৃত হয়েছে, তাতে

---

১১. Engels, Frederich , Letter to Margaret Harkness, Compiled by Mayanard Solomon, Marxism and Art, Detroit, 1979, pp. 269-271.

১২. Ibid , pp.267-268 .

১৩. LENIN, On Literature and Art, Moscow, 1987, p.31.

Dhaka University Institutional Repository

করে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে আর সরাসরি রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুত, সমাজের পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলো যতই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, রাজনীতি ততই সবাইকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন দেশে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম শক্তি সঞ্চয় করে। ইতোমধ্যে বিশ্বের কয়েকটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সবের প্রভাবে বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তরের এক প্রগতিশীল স্রোতোধারা প্রবাহিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূলে। এ অবস্থায় বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা, শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা শিল্প-সাহিত্যের বিষয়, বক্তব্য এবং আঙ্গিকে আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে এ প্রবণতা দেখা গেছে। নাটকে সর্বহারামুখী বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন ফরাসী চিন্তাবিদ, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তা রোমাঁ রোলাঁ। গণমুখী নাটকের বিষয় এবং প্রকরণ সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত রূপরেখাও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন 'পিপল্‌স থিয়েটার' (১৯১৩) নামক গ্রন্থে ।[১৪] ফরাসী বিপ্লব নিয়ে রচিত তাঁর '১৪ই জুলাই' নাটকে এর প্রয়োগও তিনি শুরু করেছিলেন। এ ছাড়া রাশিয়াতে বিপ্লব সংহত করার জন্য 'থিয়েটার হচ্ছে অস্ত্র' শ্লোগান নিয়ে 'লিভিং নিউজপেপার'-সহ কয়েক ধরনের 'এ্যাজিট-প্রপ' (Agitation-Propaganda) ধর্মী নাট্য আঙ্গিকেরও সৃষ্টি হয়। [১৫] একই উদ্দেশ্যে জার্মানিতেও এরভিন পিস্‌কাটর ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রলেতারীয় থিয়েটার' । ঘোষণা করা হয় যে, 'প্রতিটি শিল্পগত উদ্দেশ্যকে বিপ্লবী আদর্শের অধীন' করা হবে এবং সচেতনভাবে শ্রেণীসংগ্রামের ধ্যান-ধারণা প্রচার করা হবে। [১৬] এরপর পিস্‌কাটর 'রেড রেভ্যু' (১৯২৪) নাটক রচনা করে জার্মানির শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে মঞ্চস্থ করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, পিস্‌কাটর প্রযোজিত 'পতাকা' (১৯২৪) নাটকের আঙ্গিক থেকেই তাঁর উত্তরসূরী এবং মার্কসবাদী নাট্যকার বের্টোল্ট

১৪. রোমাঁ রোল্যাঁর পিপল্‌স থিয়েটার (অনু: রথীন চক্রবর্তী),কলকাতা, ১৯৮৬।

১৫. জিয়া হায়দার, নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.৪৯।

১৬. বিষ্ণু বসু, 'পোলিটিক্যাল থিয়েটার কেমন হবে', গ্রুপ থিয়েটার, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রেশ্‌ট 'এপিক থিয়েটার' তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন ।[১৭] বলা বাহুল্য, ব্রেশ্‌ট -এর 'এপিক থিয়েটার' বিশ্বনাট্যে এক বৈপ্লবিক আঙ্গিকের জন্ম দেয়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শৈল্পিক হাতিয়ারে পরিণত হয় এ রীতি। সাধারণ নাটকে দর্শক প্রায়ই কাল্পনিক জগতের ছবি দেখে মোহগ্রস্ত হয়। সেখানে দর্শক আবেগের দিক থেকে নাট্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে থাকে যে, তার বুদ্ধি এবং বিবেচনাবোধ সক্রিয় থাকে না। ফলে নাট্যঘটনার সমান্তরালে বিদ্যমান বাস্তব সমস্যা তার মনে কোন চিন্তার উন্মেষ ঘটায় না। পক্ষান্তরে 'এপিক থিয়েটার' নাটককে মায়া নয় বাস্তব হিসেবেই উপস্থাপন করে বলে দর্শক নাট্য ঘটনায় সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারে না। নাটকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক দূরত্বে অবস্থান করার ফলে সে আবেগাপ্লুত না হয়ে নাট্যঘটনাকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এর ফলে, দর্শকের মনে বাস্তব অবস্থা সর্বদা জাগরূক থাকে এবং নাট্যঘটনার সমান্তরাল বাস্তব সমস্যা সমাধানে কার্যকর চিন্তার উন্মেষ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে ।[১৮]

প্রসঙ্গত বিবেচ্য বিষয় হলো, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজের উপরি-কাঠামোর উপাদান হয়ে অবকাঠামো (Basic structure) পরিবর্তনে ভূমিকা নিতে পারে কি না। তাত্ত্বিকদের মতে, শ্রমজীবী মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তাদের মাধ্যমে সমাজের মৌল কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। সমালোচক ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেন , 'শিল্প মানুষের আবেগ ও প্রবৃত্তির মাধ্যমেই সমাজের ওপর কাজ করে'। [১৯] শিল্প মানুষের আবেগকে সংগঠিত রূপ দান করে, মানুষের প্রবৃত্তিকে (Instinct) পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের সঙ্গে অন্বিত করে এবং নতুন চিন্তার জন্ম দেয় ।

১৭. উৎপল দত্ত, 'পিস্‌কাটর : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক', এপিক থিয়েটার,নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা, ১৯৯৩।

১৮. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় , ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার, কলকাতা, ১৯৮২।

১৯. 'ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি', ক্রিস্টোফার কডওয়েল , উদ্ধৃত, শ্রী হীরেণ ভট্টাচার্য, মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব (সম্পা . সুহাস চট্টোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহূর্তেই তা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।[২০] আর এই বাস্তব শক্তিই সমাজ বিপ্লব ঘটায়।[২১] এঙ্গেলস-এর একটি চিঠিতেও এর সমর্থন মেলে :

> Political, juridical, philosophical, religious, literary, artistic, etc., development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic basis. It is not the economic situation, which is solely active, while everything else only has passive effect. There is, rather, interaction on the basis of the economic necessity, which ultimately always asserts itself.[২২]

এ লক্ষ্য নিয়েই রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কি, মায়কোভস্কি, অস্ত্রভস্কি, সের্গেই আইজেনস্টাইন; ফ্রান্সের ইউজিন পতিয়ে, লুই আরাগঁ, আঁরি বারবুস; চিলির পাবলো নেরুদা; আমেরিকার হাওয়ার্ড ফাস্ট, পল রোবসন; তুরস্কের নাজিম হিকমত; জার্মানির পিস্‌কাটর, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টসহ বিশ্বের বহু কবি- সাহিত্যিক-নাট্যকার-শিল্পী তাঁদের সৃষ্টিতে সমাজ প্রগতির পক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ করা যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তাদের গান-নাটক-কথিকা ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে সংগ্রামে ও যুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

শিল্প-সাহিত্যের এই ক্ষমতা আছে বলেই লেনিন এবং মাও সে-তুঙ রাশিয়া ও চীনে বিপ্লব সফল করে তোলার জন্য শিল্প-সাহিত্য হাতিয়ারের মতো ব্যবহারের কথা

২০.'যে মুহূর্তে কোন মতবাদ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সেই মুহূর্তেই ঐ মতবাদ বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।' হেগেলের 'ফিলজফি অফ রাইট' সম্পর্কে মার্কস, উদ্ধৃত, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.১১১।

২১. হীরেণ ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.১২।

২২.Engels to H. Starkenburg, MARX AND ENGELS, Selected Correspondence (1846-1895), London, 1943, p.517।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন । লেনিন চেয়েছেন :

> Literature must become part of the common cause of the proletariat, 'a cog and a screw' of one single great Social Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class. Literature must become a component of organised planned and integrated Social-Democratic party work. [২৩]

লেনিনের এই 'পার্টিজানশিপ' দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প-সাহিত্যের উপযোগবাদের প্রতি পক্ষপাত আছে। চীনের মাও সে-তুঙ-ও এ দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেছেন :

> উপযোগবাদ-উর্ধ্ব কোন 'বাদ' পৃথিবীতে নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপযোগবাদও কোন না কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপযোগবাদই হতে পারে। আমরা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী উপযোগবাদের অনুসারী । [২৪]

অবশ্য তাই বলে মার্কস, এঙ্গেল্‌স, লেনিন কিংবা মাও সে-তুঙ কেউই শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য উপেক্ষা করার কথা বলেন নি। শিল্পগুণহীন বক্তব্য নির্ভর সাহিত্যকে তাঁরা উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'Down with non-partisan writers!' বলেও লেনিন কর্তৃক তলস্তয়কে 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' হিসেবে আখ্যায়িত করা সে কথাই প্রমাণ করে। আর মাও সে-তুঙ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন :

> আমাদের দাবী হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একত্ব, অন্তর্বস্তু ও রূপের একত্ব, বিপ্লবী রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু ও যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্পরূপের একত্ব। শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলীর অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। [২৫]

---

২৩. LENIN, Ibid, pp.25-26.

২৪. মাও সে-তুঙ, 'সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ', পিকিং, ১৯৭৭. পৃ.১০০।

২৫.ঐ,পৃ.১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য প্রগতিমূলক হলেও শিল্পমূল্যহীন রচনা আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্প সৃষ্টি করতে না চাইলেও শিল্পীর অজান্তে তাঁর সৃষ্টিতে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব নয়।

বস্তুত, সংক্ষেপে বলা চলে :

এক. শিল্পী-সাহিত্যিকরা অন্যান্য সামাজিক মানুষের মতোই রাজনীতি-নির্ভর। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে কারও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও কেউই রাজনীতির বাইরে যেতে পারেন না।

দুই. সাধারণভাবে লেখকের শ্রেণী-অবস্থান তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কখনও কখনও লেখকের নিজস্ব অনুধাবন, অভিজ্ঞতা ও বিবেকের তাড়নার প্রভাবে সচেতন কিংবা অবচেতনে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করতেও সক্ষম হন।

তিন. বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের নিপীড়ন থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন শিল্পী-সাহিত্যিক সরাসরি প্রগতিশীল রাজনৈতিক শিল্প সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকে রাজনীতি

রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব বহুমাত্রিক। এই সময়ের নাটকে রাজনীতি এসেছে কখনও সমাজ সংস্কারের রূপে, কখনও সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত নিপীড়নের প্রতিরোধ হিসেবে; কিংবা কখনও ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় চেতনার জাগরণরূপে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৩৩ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে ভারতে ব্যাপকভাবে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি-লগ্নি শুরু হয়। সেই সঙ্গে চলতে থাকে এর প্রয়োজনীয় সহায়ক কাঠামো তথা রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ,টেলিগ্রাফের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রাথমিক শর্তসমূহ পূরণের কাজ। স্বাভাবিকভাবে এ সব কর্মকাণ্ড ভারতীয় সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আঘাত হেনে পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে ;এর পাশাপাশি অনিবার্যভাবে এখানে সৃষ্টি করে বুর্জোয়া ভাবধারার এক নতুন ধনিক শ্রেণী। এই শ্রেণী একদিকে নিজস্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, অপর দিকে সনাতন সামন্ত সমাজের পশ্চাৎপদ প্রথাসমূহ ভেঙে ফেলতে সচেষ্ট হয়। ফলে সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন , বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ ও কুলীন প্রথার বিলোপ ইত্যাদি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন যেমন চলতে থাকে তেমনি শুরু হয় ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় চেতনার ভাব-জাগরণ।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা নাটকে সমাজ ও রাজনীতির এ সব উপাদান কমবেশি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে নাট্যকার কুলীন প্রথার অসঙ্গতি ও এর প্রতিপালনে সমাজে যে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা তুলে ধরেছেন। এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যোগ্য কুলীন পাত্র না পেয়ে অবশেষে এক কুৎসিত বৃদ্ধের কাছে চারটি কন্যা সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে কুল রক্ষার স্বার্থে চার কন্যার জীবন ব্যর্থ হওয়ার যন্ত্রণাবিদ্ধ এই

Dhaka University Institutional Repository

নাটক তৎকালীন বাঙালি সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। নাটকটির কয়েক বার সফল মঞ্চায়ন তৎকালীন সমাজমানসে এ সব কুসংস্কারের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে তুলেছিল [১]

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সাফল্যের পর সমাজ সমস্যামূলক নাটক রচনার ধারা শুরু হয়। রচিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' (১৮৫৭), বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা পরিণয়োৎসব' (১৮৫৭) , তারাপদ চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) , দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) ইত্যাদি নাটক। হিসেব করে দেখা যায়, ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এরকম সামাজিক সংস্কারমূলক নাটক রচিত হয়েছে প্রায় ২৭টি। এর মধ্যে বিধবা বিবাহ বিষয়ে ১২টি, কৌলীন্য প্রথা নিয়ে ৩টি, বহুবিবাহ বিষয়ে ৫টি এবং সামাজিক ভ্রষ্টাচার নিয়ে রচিত হয় ৭ টি নাটক। [২]

এর মধ্যে মাইকেলের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে এদেশি জমিদারদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হেতু প্রজা শোষণের আরেক মাত্রা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ভক্তপ্রসাদ নামে এক বকধার্মিক জমিদারের লাম্পট্য এবং পরিণামে তার উচিত সাজা পাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মাইকেলের জীবনচরিত লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসুর সূত্রে একজন সমালোচকের ধারণা, মধুসূদন তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটির বাস্তব উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। [৩] ধারণা করা যায়, জমিদার শ্রেণীর প্রতি মাইকেলের এই তীব্র কটাক্ষের কারণে প্রহসনটি বেলগাছিয়া থিয়েটারে কখনও অভিনীত হয় নি।

---

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ.৫৩৮।

২. শ্রী হীরেণ ভট্টাচার্য, 'নাটক ও নাট্য আন্দোলনের সামাজিক দায়িত্ব', মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, সম্পা. শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.১৪১-১৪৩।

৩. 'Mr Yogindra Nath Basu points out that certain incidents in the play are founded on fact and that the character of Bhaktaprasad is concieved after a very close relative of Madhusudan's own.' P.Guha- Thakurta, The Bangali Drama- Its Origin and Development, London, 1930, p.85।

Dhaka University Institutional Repository

এ দিকে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ইতোপূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব্য জমিদার এবং ইজারাদারদের[৪] লাগামহীন শোষণে চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। নব্য নীলকরদের অত্যাচারে তারা হয়ে পড়ে দিশেহারা । সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে অভুক্ত রেখে খাদ্য রপ্তানি এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অন্যায় মজুতের কারণে দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত ঘটে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের কৃষকেরা দুর্ভিক্ষকবলিত হয়েছে চব্বিশবার। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দুই কোটি আশি লক্ষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৫] তৎকালীন বাংলার ভাইসরয় চার্লস ইলিয়ট ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছিলেন :

> আমি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, ব্রিটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার পরিপূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনো জানিতে পারে না।[৬]

৪.'খাজনা আদায়ের অধিকারটি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা তখন জমিদারদের মধ্যে একটি নিয়মে দাঁড়িয়েছিল।এ দ্বিতীয় ইজারাদার আরও চড়া দরে এটি আরও একজনের কাছে বিক্রি করতো। বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বর্ধমানের রাজার কার্যকলাপ এরই একটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত।' ভারতবর্ষের ইতিহাস,মস্কো,১৯৮৬,পৃ. ৪১৬।

৫. 'It has already been noted that, while in the first half of the nineteenth century there were seven famines with an estimated total of 1.5 million deaths, in the second half of the nineteenth century there were twenty-four with an estimated total of 28.5 million deaths, and eighteen of these twenty-four famines fall into the last quarter of the nineteenth century'.R.Palme Dutt, India To-day, Calcutta, 1986, p.308 ।

৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা,১৯৯৩,পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব শোষণ এবং অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভারতের কৃষকরা ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বহু বিদ্রোহের সূচনা করে। যেমন, নীল বিদ্রোহ(১৮৬০), আসামের কৃষক বিদ্রোহ, সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৬১-১৮৯৪), দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ (১৮৭৫), মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-১৮৯৬), কোল বিদ্রোহ (১৮৫৭ -১৯০০) ইত্যাদি।[৭] বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[৮] সুষ্ঠু সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই বিদ্রোহগুলো ব্যর্থ হলেও এগুলো ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদ এবং জমিদার মহাজনদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর স্থানীয় সংগ্রাম।

আলোচ্য পর্বের নাটকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং দেশি জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের উক্ত সংগ্রামের ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'(১৮৬০), মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) , উপেন্দ্রনাথ দাস-এর 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭১) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৩), দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৬) ইত্যাদি নাটকে। এর মধ্যে 'নীলদর্পণ'-এর জনপ্রিয়তা ছিল অভাবিতপূর্ব। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে বাংলার চাষীদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল, তার এক বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি 'নীলদর্পণ' নাটক। নীলকররা চাষীদেরকে টাকা এবং নীলবীজ দাদন দিয়ে নীলচাষে প্রবৃত্ত করতো। কিন্তু উৎপাদিত নীলের মূল্য দিতো খুবই কম। শুধু তাই নয়, নীলের পুরো দাম তারা কখনও চুকিয়ে দিতো না। ফলে কৃষকেরা বছরের পর বছর নীলচাষ করতে বাধ্য হতো। এর মধ্যে চাষের খরচ দ্বিগুণ হলেও সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হতো না । চাষীরা এর বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের ওপর সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হতো। দরিদ্র কৃষকদের অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া ও নারী ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন ঐতিহাসিকের মতে, আফ্রিকার নিষ্ঠুর ইংরেজ দাস

৭. সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত ।

৮. 'নোয়াখালি চট্টগ্রাম বাদে মধ্য ও পূর্ব বাংলার প্রায় সব জেলাতে অল্প বিস্তর কৃষক আন্দোলন হতে দেখা যায়। ১৮৭৪-৭৫ সনে ঢাকা ত্রিপুরা ও অন্যান্য স্থানে কৃষকরা জমিদারের সম্পত্তি নষ্ট করে দেয় ও খাজনা বন্ধ (No rent campaign) করে।' সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), কলকাতা, ১৯৮৭ , পৃ.২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকার নিষ্ঠুর ইংরেজ দাস ব্যবসায়ীদেরই এখানে নীল কুঠিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। এদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করেও কোন সুফল পাওয়া যেতো না।[৯] অগত্যা এর প্রতিকারে কৃষকেরাও দল বেঁধে নীলকরদের ভাড়াটে লাঠিয়ালদের আক্রমণ করতে শুরু করে। প্রায় দেড় লক্ষ কৃষক যোগ দেয় এই বিদ্রোহে। এভাবে ১৮৬০-৬১ সালে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করলে ইংরেজ প্রশাসন 'নীল কমিশন' গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার এদেশে জোরপূর্বক নীলচাষ করানো বন্ধ করে দেয়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর চাকুরীসূত্রে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনকালে চাষীদের অত্যাচারিত হওয়ার এই ঘটনা জানতে পারেন এবং প্রধানত এই নিপীড়ন নিবারণের উদ্দেশ্যেই 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন।[১০] যথার্থ দর্পণের মতোই এ নাটকে নীলকরের অত্যাচারে চাষীদের দুর্দশা এবং আদালতে নালিশ করেও প্রতিকার না পাওয়ার দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলভাবে আদৃত হয় নাটকটি। এটিকে কেন্দ্র করে সে সময়ে বাংলাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা স্মরণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত নীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না, ঘটনা সকল সত্য কি না–অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না। নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, তোরাপ আমাদের ভালোবাসা কাড়িয়া লইল, ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল রোগ

---

৯. সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৫৩।

১০.'নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক- তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা ।'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকা থেকে,মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী ,কলকাতা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

রোগ সাহেবকে যদি পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।[১১]

নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমমত পোষণ করে এক ইংরেজ মিশনারি(James Long) প্রকাশ করেন নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ। শুধু তাই নয়, এর কিছু কপি ইংল্যান্ডেও পাঠানো হয়। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ প্রশাসন এই নাটকের প্রতি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয় এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশক পাদ্রী জেমস লঙ-কে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে। এমন কি কোন কোন ইংরেজ দর্শক এ নাটক চলাকালে মঞ্চেও হামলা করেছিল বলে জানা যায়। লক্ষ্ণৌ শহরে 'নীলদর্পণ' মঞ্চায়নের সময় 'ক্ষেত্রমণি উদ্ধার' দৃশ্যে চাষী 'তোরাপ' ইংরেজ 'রোগ' সাহেবকে আঘাত করতে উদ্যত হলে কয়েকজন ইংরেজ তলোয়ার নিয়ে মঞ্চে উঠে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল অনুষ্ঠান।[১২] একজন সমালোচকের মতে, "একটি নাটককে কেন্দ্র করে আলোড়নের এমন উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই।"[১৩]

উপেন্দ্রনাথ দাস-এর 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তেও ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ইংরেজ পীড়ন, আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার, ইংরেজ চরিত্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান ইত্যাদি উপাদান নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয় তাঁর নাটকে। ফলে এ নাটকও ইংরেজ সরকার অশ্লীলতার অজুহাতে বন্ধ করার চেষ্টা চালায় এবং নাট্যকারের একমাসের কারাদণ্ডাদেশ ঘোষণা করে। 'জমীদার দর্পণ' এবং 'চা-কর দর্পণ' নাটকেও জমিদার ও ইংরেজ চা বাগান মালিকের ঘৃণ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন- চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। এই সময় ইংল্যান্ডের যুবরাজ ভারত সফরে এলে কলকাতার এক হিন্দু বাড়িতে ঘটা করে বরণ করা হয় তাকে। ঘটনাটি তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হিন্দু সম্প্রদায় বিষয়টিকে চিহ্নিত করে জাতীয় অমর্যাদা হিসেবে। ফলে উক্ত

---

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা ১৯৮৩,পৃ.২২৪।

১২. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ.১৩৮।

১৩. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের কর্তা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন পত্র-পত্রিকা কর্তৃক হিন্দু পরিবারের সম্মান বিনষ্টকারীরূপে পরিগণিত হয়।'অমৃত বাজার' পত্রিকায় লেখা হয়:

> হিন্দু সমাজ সকল নিপীড়নই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। ... অনারেবল জগদানন্দের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি তাহাতে তাঁহার বিস্তর সম্মান হইয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্যও বিস্তর হইয়াছে তবে কেন তিনি এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুজাতির কলঙ্ক করিলেন, হিন্দু মাত্রের মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলেন। [১৪]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা লেখে :

> That the national feeling had been outraged at the price the babu paid for his honour.[১৫]

এ ঘটনায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বিদ্রূপ করে একটি নাটকও রচিত হয় 'গজদানন্দ প্রহসন' (১৮৭৬) নামে। উল্লেখ্য, প্রহসনটি উপেন্দ্রনাথ দাস-এর 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের সঙ্গে মঞ্চস্থ হতো। এতে ব্রিটিশবিরোধী ভাব প্রচার লাভ করে আরো তীব্রতা। স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে এবং এ নাটক মঞ্চায়নে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। পুলিশী বাধার মুখে প্রহসনটি ভিন্ন নামে–'হনুমান চরিত'–মঞ্চস্থ হতে থাকলে প্রশাসন 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) পাস করিয়ে বন্ধ করে দেয় নাটক দুটোর অভিনয়।

সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতামূলক ভাব প্রকাশ এড়িয়ে জাতীয়তাবোধ বিকশিত করার প্রচেষ্টাও তৎকালীন নাটকে দেখা যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর সচেতন প্রয়াসে এ সময়ের নাট্যকাররা প্রধানত হিন্দু পুরাণ, ধর্ম এবং ঐতিহাসিক বীরচরিত্রের কাহিনী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬০) নাটকে। রাজস্থানের এক ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ নাটকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণের কণ্ঠে যে স্বদেশভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার অনুরণন পাওয়া যায়। বহির্শত্রুর দ্বারা

১৪. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য,পূর্বোক্ত .পৃ.৩৩২-৩৩৩।
১৫. ঐ, পৃ. ৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবলভাবে আক্রান্ত ভীমসিংহের খেদোক্তিতে উনিশ শতকের নিঃসহায় পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মাবমাননাই তাতে যেন পরিস্ফুটিত :

> এ ভারতভূমির কি আর সেই শ্রী আছে। এদেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না। ...হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টধারী নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট কর্য্যে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। [১৬]

মন্তব্যটি আসলে ইংরেজের কাছে পরাধীন ভারত সম্পর্কেই করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে সমকালীন দেশ হিতৈষণার এই চেষ্টা পরবর্তী সময় অর্জন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। একই সময় কলকাতায় হিন্দু মেলার সূচনা (১৮৬৭) এবং জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা বহু ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে। ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এদিক থেকে সর্বাগ্রে উল্লেখিত হতে পারে। তাঁর প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪)-এ তিনি অবলম্বন করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীকরাজ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং পাঞ্জাবের নরপতি পুরুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক কাহিনী। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় রাজাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকলেও এ নাটকে পুরুকে ভারতের রাজাদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, স্বভাবতই আক্রমণকারী সেকেন্দর শাহ (আলেকজান্ডার) তৎকালীন উপনিবেশবাদী ইংরেজ এবং পুরু পরাধীন ভারতবর্ষের নায়কে পরিণত হয়। এ ভাবে নাটকটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ভারতবাসীর স্বাদেশিকতাবোধ জাগরণের ক্ষেত্রে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকেও রামদাসের খেদোক্তিতে প্রকারান্তরে নাট্যকারের ব্যক্তিচিত্তের বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস বাণীরূপ পেয়েছে :

> তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন
> হয়ে পদানত, দাস ব্রতে রত, কি সুখে
> বাঁচিব বল– মরণই জীবন। [১৭]

---

১৬. কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৮৭,পৃ. ৩১৩।

১৭. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, হরলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ নাট্যকারও তাঁদের রচিত নাটকে স্বাধীনতালিপ্সু ভারতবাসীর মনোভাব সচেতনভাবে প্রতিফলিত করেন। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) রূপক নাটকে তৎকালীন ভারতের দুর্দশার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি সবাইকে জানান এর অবসান ঘটাবার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান। তাঁর 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) নাটকে স্বাধীনতা-স্পৃহা আরো তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত । এর একটি সংলাপে আছে :

স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণমন,
লভিতে সে ধন কররে যতন।
মনে কর সেই আর্য্যসুতগণে,
হরিণ ভবনে, সিংহ সম রণে।
ঐ শোন কাঁদে ভারত জননী।
হাহাকার করি লুটায়ে ধরণী।
হারায়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা-মণি।[১৮]

নাট্যকার মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটকের মোড়কে সমকালীন ভারতের করুণ অবস্থার বর্ণনা করেন 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) নাটকে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় এ নাটকে কৌশলে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমালোচকের মতে, তৎকালীন সংবাদপত্রে উত্থাপিত সমস্যাবলীর সঙ্গে এসবের নিকট সামঞ্জস্য ছিল। [১৯] এ নাটকে ইংরেজকে তুঙ্গ দ্বীপবাসী রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি গানের কিছু অংশে তার স্পষ্টতা লক্ষণীয় :

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।

১৮. ঐ, পৃ.২৮৩।

১৯. ঐ, পৃ.২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষী শেষে
হায় গো রাজা কি কঠিন্। [২০]

নাট্যকার হরলাল রায় 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটকে বখতিয়ার খিলজির বাংলাদেশ অধিকারের কাহিনী অবলম্বন করে জাতীয়তাবোধ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তবে এ নাটকে যে পরিমাণ মুসলিম বিদ্বেষ দেখানো হয়েছে তাতে জাতীয় চেতনাবোধ খণ্ডিত হয়ে পড়েছে বলে অনুমান হয়।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনার সফল জাগরণ অনেকখানি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক 'বঙ্গভঙ্গ আইন' বলবৎ হলে তার প্রতিবাদে সারা বাংলায় গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। সে সময়ই গিরিশ ঘোষ রচনা করেন 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫) নাটক। এখানে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে স্বাধীনতা প্রেমিক শৌর্যবীর্যের প্রতিমূর্তিরূপে চিত্রিত করেন। ফলে তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিতে নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এ নাটকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ইংরেজ-এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান সিরাজ চরিত্রের মুখে এভাবে শোনা যায় :

বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ–
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। [২১]

---

২০. ঐ, পৃ.২৯২।

২১. গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড , কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ.৫৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত তাঁর নাটক 'মীর কাসিম' (১৯০৬) জনপ্রিয়তায় 'সিরাজদ্দৌলা'কে ছাপিয়ে গিয়েছিল। মিনার্ভা থিয়েটারে একটানা সাত মাস চলার পর ব্রিটিশ সরকার নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে।[২২] এ নাটকের একটি সংলাপে তীব্র দেশপ্রেম এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

> কাসিম। ... আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর;–কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হ'তে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান ;–শত্রুদমন বা প্রাণবিসর্জ্জন ।[২৩]

'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৬) নাটকও গিরিশের স্বাদেশিক চেতনার প্রকাশ। শিবাজী মধ্যযুগের একজন হিন্দু (মারাঠী) বীর হলেও এ নাটকে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।[২৪] শিবাজীর একটি সংলাপে আছে :

> স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। (প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক) [২৫]

নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) স্বদেশী পটভূমিতে 'সাবাস বাঙালী' (১৯০৬) নাটক রচনা করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের যশোগাথা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, স্বদেশী আন্দোলনের একটি উপাদান ছিল বিদেশি দ্রব্য পরিহার এবং দেশি দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহ সৃষ্টি করা। এ চেতনা সৃষ্টিতে উক্ত নাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটকের একটি গান তৎকালীন সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল :

> মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
> মাথায় তুলে নে রে ভাই,

---

২২. ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ.ত্রিশ (ভূমিকাংশ) ।

২৩. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ.৩১৯।

২৪. ঐ, ৩য় খণ্ড,পৃ.৩৬৫।

২৫. ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৯।

Dhaka University Institutional Repository

দীন দুখিনী মা-যে তোদের

তার বেশি আর সাধ্য নাই। [২৬]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে দেশবাসীর অন্তরে শক্তি ও সাহস জোগাবার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩) ও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭) নাটক দুটি দেশাত্মবোধ জাগরণে বেশ সহায়ক হয়েছিল।

এ সময়ের একজন প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। তিনি প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) ইত্যাদি নাটকে আছে সেই চেষ্টার স্বাক্ষর। 'নূরজাহান' (১৯০৮) ও 'সাজাহান' (১৯০৯) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে যে ধর্মীয় সংস্কার এবং অধ্যাত্মবাদের আবহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ছায়াপাত করে নি। তিনি অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তে তীব্র মানবিকতা এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটকে স্বদেশানুরাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।[২৭]

দেখা যাচ্ছে, বাংলা নাটক প্রায় প্রথম থেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতা অঙ্গীকৃত করেছে। সে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গেও থেকেছে কম-বেশি সম্পৃক্ত। এ সংগ্রামের প্রকৃতি তৎকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক পরিমাণে প্রগতিশীল। কারণ, তা ছিল উদীয়মান বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের পক্ষে সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংস্কারমূলক রাজনৈতিক সংগ্রাম। অবশ্য জাতীয় ভাবোদ্দীপনার সব নাটকই যে সমাজ-প্রগতির রাজনীতিতে পরিপূর্ণভাবে স্থিত ছিল–এমন বলা হয়তো যাবে না। বিশেষত, জাতীয়তাবাদী ভাব প্রকাশক রোমান্টিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় নাটকসমূহ ব্রিটিশবিরোধী ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কখনও কখনও ধর্মীয় সংকীর্ণতারও জন্ম দিয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, এ পর্যায়ে হিন্দু অবতার, মহাপুরুষ, পুরাণ, ঐতিহাসিক যোদ্ধা নিয়ে লেখা হয়েছে চল্লিশটিরও বেশি নাটক । কারণ হিসেবে ধারণা করা চলে যে, তৎকালীন রাজনৈতিক

২৬. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৭।

২৭. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩২-১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিকোণে পরাক্রমশালী ইংরেজ বা পাশ্চাত্য ভাব-পরিমণ্ডলকে অস্বীকার কিংবা বিরোধিতা করার জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের পক্ষে ধর্মকে আশ্রয় করা ছিল খুবই সহজ।[২৮] তাই ঐতিহাসিক চরিত্র বা কাহিনীনির্ভর নাটকের প্রোটাগনিস্ট চরিত্র মুসলমান বিজেতা বা শাসকের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই বীরত্ব প্রকাশ করেছে। এর ফলে নাট্যকারের উদ্দেশ্য যা-ই থাক, সাধারণ দর্শকের মনে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি অসম্ভব ছিল না। নাটক চলাকালে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের কাহিনীতে একজন মুসলমান ধারণ করে ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ। একটি দৃশ্যে সে নায়িকা সরোজিনীকে বলি দিতে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তার পরিচয় উদঘাটিত হয়ে যায়। এই দৃশ্যে দর্শকের মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বেসামাল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[২৯] তেমনি, গিরিশ ঘোষের 'সৎনাম' (১৯০৪) নাটকের কাহিনী সংস্থাপন নিয়েও কয়েকজন মুসলমান আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৩০]

একজন সমালোচকের মতে, তৎকালীন রাজনীতিতে কংগ্রেসের চরমপন্থীরাই ব্রিটিশবিরোধিতার উপকরণ হিসেবে বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের জন্য

২৮. 'একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তো ছিলই; সেটি ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া খুবই সহজ ছিল। ধর্ম ছিল ঐতিহ্যের মধ্যে, অভ্যাসের ভেতরে। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন ছিল একটি আশ্রয়ের। বিদেশি শাসক যতই কৃপা করুক, সম্মান করত না; আত্মসম্মান রক্ষা করবার একটা জায়গা দরকার ছিল। ধর্মের কাছ থেকে সেটা পাওয়া গেল। তৃতীয়ত, ধর্ম একটি আত্মপরিচয়ের ব্যাপারও হয়ে দাঁড়াল। এই পরিচয় নিয়ে গর্ব করা যায়, এর ভিত্তিতে নিজেদের সংগঠিত করা চলে এবং এর সাহায্যে নিচে যাদের অবস্থান সেই জনগণকে কাছে ডেকে বিনামূল্যে ব্যবহার করাও সম্ভব হয়।' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'মেকওলে বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ' , মুক্তকণ্ঠ সাময়িকী ,১৯ জুন ১৯৯৮।

২৯. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত ,পৃ.১৩২-১৩৩।

৩০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ.৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক বাল্য-বিবাহ ও গো-রক্ষা আন্দোলনের সমর্থন সেই প্রবণতাকে উচ্চকিত করে তোলে। [৩১]

বস্তুতপক্ষে, শাসক ব্রিটিশের উন্নত পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তৎকালীন নেতারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন নি। আর এ ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিজাত বললে ভুল বলা হয় না । কারণ, তৎকালীন বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হয় নি যে, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর প্রগতিশীল ও বিকল্প সংস্কৃতিই হতে পারে ব্রিটিশদের চেয়ে উন্নততর সংস্কৃতি। [৩২] রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'নীলদর্পণ' কিংবা 'জমীদার দর্পণ'-এর লেখকদের সে সমস্যায় পড়তে হয় নি। কারণ এ নাটকসমূহে ইংরেজ বা জমিদারের নিগ্রহের শিকার সরাসরি শোষিত শ্রেণী তথা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোটা কৃষক সমাজ। অর্থাৎ, বাস্তব শোষণ এবং তার প্রতিরোধমূলক বিষয় নিয়েই এ নাটকগুলো রচিত হয়েছে; অতীতের ভাব-ঐতিহ্য আশ্রয় করার প্রয়োজন পড়ে নি। তাই এ নাট্যকারদের শ্রেণীগত অবস্থান যা-ই হোক না কেন, নাট্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা তাঁদের শোষিত শ্রেণীর অন্তর্বর্তী করে ফেলেছিল। আর জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচয়িতারা উল্লিখিত

---

৩১. 'The Orthodox Nationalist believed that in this way they were building up a mass national movement of opposition to imperialism. Only so can be explained that a man of the intellectual calibre of Tilak should have lent himself to such agitations as his campaign in defence of child-marriage or his Cow Protection Society ', R.Palme Dutt, Ibid , p. 328।

৩২.' They could not, on the basis of experience then in India , have any conception of the rising working class outlook and culture which alone can be the alternative and successor to bourgeois culture going beyond it, taking what is of value and leaving the rest',R.Palme Dutt, ibid , p.327।

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ প্রক্রিয়া বিষয় হিসেবে না আনায় তাঁদের প্রায়শই তৎকালীন হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রবণতাকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। এর ফলে অনেক সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পাওয়ার পাশাপাশি নাটকের শিল্পমান হয়েছে দুর্বল। গিরিশ ঘোষ সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্যে তার সমর্থন মেলে : 'সাধারণ বাঙালির মনে ধর্মভীরুতা ও ন্যায়ান্যায়বোধের যে ধারণা আছে গিরিশের আদর্শ তাহারই অনুগত'। [৩৩] এ প্রবণতা অন্যান্য নাট্যকারকেও প্রভাবিত করেছে। সমালোচক অজিত কুমার ঘোষের মতে :

> ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে (এই) * প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে এক কালে বহু গ্রন্থ রচিত হইতে দেখিয়াছি সেই বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কঠোরভাবে নিন্দিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্যালোকিত মুক্ত জগতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যম্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৌরাণিক আদর্শপ্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামীভক্তির এক ধন্বন্তরী সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন। [৩৪] [* প্রথম বন্ধনী বর্তমান লেখকের ।]

এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বলা যায়, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের বাংলা নাটক প্রথম থেকেই সমাজ ও রাজনীতিকে অঙ্গীকৃত করেছে এবং তাতে সংস্কার চেতনা, প্রতিরোধ চেতনা ও জাতীয় চেতনা পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা নাটকের উল্লিখিত (জাতীয় ভাবোদ্দীপক) পর্যায়ে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। বালক বয়সে উক্ত নাটকসমূহে উপস্থাপিত দেশাত্মবোধ এবং ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তাঁকেও প্রভাবিত করেছিল। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের জন্য তিনি যে গান লিখে দিয়েছিলেন তাতে এর আভাস পাওয়া যায় :

---

৩৩. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৪৩।

৩৪. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।।
... ...
... ...
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজি সঁপিব জীবন–
ওই যবনের শোন্ কোলাহল
আয় লো চিতায় আয় লো সই। [৩৫]

তেমনি উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯)-ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান সংযোজিত হয় :

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়। [৩৬]

অবশ্য এ চেতনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের নাটকে সেভাবে লক্ষ্য করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্বকীয়তায় তৎকালীন যুগ-বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের ইচ্ছাপূরণের জন্য নাটক লেখেন নি। লিখেছেন প্রথমত, তাঁর একান্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রসে সিক্ত মানসচেতনা প্রকাশের দাবিতে এবং দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনের

৩৫. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ.৪৮।

৩৬. ঐ, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের মানসভূমি কর্ষণের তাগিদে। ফলে তাঁর নাট্যধারা বিকশিত হয়েছে সমসাময়িক বাংলা নাটকের ধারা থেকে স্বতন্ত্র পথে । আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে :

> উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাঁহার নাট্যরচনার সূত্রপাত হইলেও সমসাময়িক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না। [৩৭]

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য রবীন্দ্র-নাটক (রূপক-সাংকেতিক) সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, 'রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাংকেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না এবং তাহার পরেও এই নাটক আর লেখা হয় নাই'। [৩৮]

বাংলা নাটকের সমসাময়িক ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাটকের এই অন্বয়হীনতা একটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক হয়েছিল। তা হলো, গিরিশ-অমৃতলাল-এর নাটকের মতো তাঁর নাটক সাধারণ দর্শকরুচির অনুগামী হয় নি। নান্দনিক এবং ভাবগৌরবের দিক থেকে এক প্রকার পরিশ্রুত রুচির ছাপ তাঁর নাট্য আবহে সর্বদাই বিরাজমান থেকেছে। নেতিবাচকতার দিকটি হলো, তাঁর নাটক তৎকালীন নগরকেন্দ্রিক বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদনির্ভর রাজনীতিকে সরাসরি প্রতিফলিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আর ব্যাপক গণমানুষ তথা গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ শ্রমজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির সঠিক প্রতিফলন ঘটানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে শ্রেণীগতভাবে তেমন সহজ ছিল না। অবশ্য সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে কোথাও কোথাও তিনি এই সীমাবদ্ধতাও অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

---

৩৭. ঐ ,পৃ.৩৮।

৩৮. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-নাটকে রাজনীতি

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) প্রকাশ করেন তখন ভারতে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা খুব একটি ছিল না। ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী কিছু সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কয়েকটি মিছিল, সভা এবং বিবৃতির মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকত।

বস্তুত ১৮৫৭ সালে মহান সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর আগে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংগঠন যেমন 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৩৮), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'প্যাট্রিয়ট এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৬৫), 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭), 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬) প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্তের প্রবেশ শুরু হয়। এর মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদের মনে প্রথম স্বজাতি ও স্বদেশচেতনা জাগাতে সমর্থ হয় হিন্দু মেলা। কিন্তু এর উদ্যোক্তারা সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এ জাগরণ হয়ে পড়ে খণ্ডিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সে সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয় নি, ধর্মাভিত্তিক পরিচিতিই ছিল প্রধান। অপর দিকে 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' ছিল জমিদার, আইনজীবী এবং শহুরে মধ্যবিত্তদের গঠিত সংগঠন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনের চেষ্টা চালাতে থাকে। এর মধ্যে 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের যে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় তা-ই পরবর্তী সময় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল সরকারের কাছে কিছু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিবছর তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে ইংরেজিতে সভাপতির দীর্ঘ ভাষণ এবং প্রচুর বক্তৃতার পর এসব দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করা হতো। তার পর সারা বছর নেতা-কর্মীদের সময় কাটতো বিভিন্ন পেশাগত কাজে। একজন ঐতিহাসিকের মতে,

Dhaka University Institutional Repository

'কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না । ছিল তিনদিনের এক মেলা'।[১] এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের শ্রেণীগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি। বেশির ভাগ নেতা ছিলেন সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান যাদের মধ্যে ছিল জমিদার, ইজারাদার, শিল্পপতি, আইনজীবী প্রমুখ। তা ছাড়া এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন কমবেশি ইংরেজস্তাবক।[২] অথচ এ সময় গ্রামাঞ্চলের কৃষকসহ বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বহু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত জমিদারবিরোধী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করছিল। শ্রেণীগত অবস্থানের কারণেই এ সব সংগ্রামের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন যোগাযোগ ছিল না।

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলার মাধ্যমে স্বাদেশিকতাবোধে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। সে সঙ্গে কিছু মাত্রায় হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজবিদ্বেষী। 'দয়ালু মাংসাশী', 'জুতা ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকে প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর নিজের প্রথম নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় এর প্রতিফলন ঘটে নি। 'বিদ্দজ্জন সভা' নামের এক প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ বার্ষিক সভা উপলক্ষে নাটকটি রচিত হয়। এ সময় কবি লন্ডন থেকে ফিরে এসে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তাই এটি হয়ে উঠেছে মূলত সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনা।

১.সুমিত সরকার , আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭ , কলকাতা, ১৯৯৫ ,পৃ.৯০।

২. যেমন , ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী বলেন: It is our good fortune that we are under a rule which makes it possible for us to meet in this manner (cheers). ..... Such a thing is possible under British rule and British rule only (loud cheers) . Then I put the question plainly : Is this congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government (Cries of No, No !) or, is it another stone in the foundation of the stability of that Government ? (Cies of Yes, Yes) ..... .Congress Presidential Addresses. Vol.1 থেকে নেপাল মজুমদার-এর উদ্ধৃতি, ভারতে জাতীয়তা ও আর্ন্তজাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ , ১ম খণ্ড , কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নিজেই বলেছেন :

> বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নতুন পরীক্ষা–অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব নহে। [৩]

'বাল্মীকি প্রতিভা'তে বলা হয়েছে : আদিকবি বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যুসর্দার। দেবী কালীর পূজা দিতেন তিনি নরবলি দিয়ে। একদিন তাঁর অনুচরেরা এক নিষ্পাপ বালিকাকে নিয়ে আসে বলি দেয়ার জন্য। বালিকার কান্না শুনে দস্যুসর্দারের মনে হঠাৎ জেগে ওঠে করুণা, জেগে ওঠে মানবতা। এর নিরসনকল্পে একদিন তিনি দলবলসহ শিকারে বের হন। কিন্তু ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ হতে দেখে তাঁর কণ্ঠ থেকে অবচেতনে নিঃসৃত হয় ছন্দোবদ্ধ পদ। এভাবে দস্যুসর্দারের মনে জেগে ওঠে সৃষ্টির বেদনা । তারপর দেবী সরস্বতী এসে তাঁকে কবিত্ব শক্তিতে অভিষিক্ত করেন।

কাহিনী পর্যালোচনা সূত্রে বলা যেতে পারে যে, এ নাটকে অমানবিকতার চর্চা থেকে এক দস্যুসর্দার জাগ্রত হলো মহান মানবিকতায়। এ কাহিনীর একটি চিরন্তন আবেদন আছে মানবচৈতন্যের কাছে এবং মানবিকতার যে উদ্বোধন এ গ্রন্থে পুনঃচিত্রিত হয়েছে তার পরোক্ষ ভূমিকা রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে থাকতেও পারে। অবশ্য এ মানবিকতা তখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে কোন তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে নি। পরবর্তী 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে তা লক্ষ্য করা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) রচনার সময় কবি অবস্থান করছিলেন কারোয়ার-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মস্থলে। সঙ্গে যথারীতি সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন। কারোয়ার কর্ণাটকের একটি সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দর। পাহাড়-নদী ও সমুদ্রের মিলনে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। দেশ থেকে দূরে থাকার দরুন তৎকালীন কলকাতার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি কবির দৃষ্টি খুব একটা নিবদ্ধ ছিল না। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি তুচ্ছ ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করলে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি। এমনকি এ সময় দেশীয় জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার অধিকার খর্বকারী ' ইলবার্ট বিল' (১৮৮৪) পাস হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথ সে

---

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন স্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী , ১৭শ খণ্ড, বিশ্বভারতী , ১৩৯৩, পৃ,৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি।[৪] এ অবস্থায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' গ্রন্থেও যে সমকালীন রাজনীতির প্রতিফলন থাকবে না তা ধরে নেওয়া হয়তো অসঙ্গত নয়।

এর কাহিনী এ রকম : এক সন্ন্যাসী ধ্যান ও তপস্যার মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর। সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবজীবনের প্রতি তাঁর অপরিসীম উদাসীনতা। এমন কি নিজের মানবিক গুণসমূহকেও তিনি সযত্নে পরিহার করার সাধনা করেন। কিন্তু এক দিন নগর ভ্রমণের সময় তিনি দেখতে পান একটি বালিকাকে অশুচি, অচ্ছ্যুৎ বলে নাগরিকেরা ঘৃণাভরে এড়িয়ে চলেছে। এই দৃশ্য দেখে বালিকার প্রতি সন্ন্যাসীর চিত্ত হয় করুণায় বিগলিত। বালিকা সন্ন্যাসীকে 'পিতা' সম্বোধন করলে তাঁর মধ্যে অপত্য স্নেহের জাগরণ ঘটে। সন্ন্যাসী বালিকাটিকে লালন-পালনের জন্য নিয়ে আসেন তাঁর গিরিগুহায়। এর পর পিতা-কন্যার বাৎসল্যের আবহে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। আপন সাধনা-বিস্মৃত সন্ন্যাসীর কাছে এ সময় মানবজীবন ও প্রকৃতি অপার সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন এ বালিকাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে জগৎ সংসারের সৌন্দর্যবার্তা। বালিকার প্রতি তাঁর স্নেহের ধারা তাঁকে নিয়ে গেছে জীবন, জগত ও প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধির পথে। এক পর্যায়ে অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর মনে তাঁর পূর্ব উদ্দেশ্যের কথা জেগে ওঠে। তাঁর মনে হয়, বালিকাটি যেন তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্যই ছলনা করতে এসেছে। এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়েটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং গুহা থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু অরণ্যপথে অন্ধকার রাতে পরিভ্রমণ করতে করতে অসহায় বালিকাটির কথা তাঁর মনে আসলে তিনি তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হতে থাকেন। এক দিকে সন্ন্যাসব্রত, অপর দিকে চিরন্তন মানবিক আবেগ। শেষ পর্যন্ত তাঁর মানবিক আবেগরই জয় হয়। সন্ন্যাসব্রত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি পুনরায় গুহা অভিমুখে ছুটতে থাকেন। কিন্তু গুহামুখে গিয়ে দেখলেন সেখানে পড়ে আছে বালিকার নিথর মৃতদেহ। বালিকা তার একান্ত আস্থা ও শ্রদ্ধার আশ্রয় সন্ন্যাসী পিতার নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসী 'এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ' বলে হাহাকার করে ওঠেন। বালিকার প্রতি স্নেহ কিংবা মানব প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন দূরে

৪. নেপাল মজুমদার পূর্বোক্ত , পৃ.৫১।

Dhaka University Institutional Repository

চলে যেতে। কিন্তু মানবিক অনুভূতি ও প্রকৃতিই তাঁকে ফিরিয়ে আনে স্নেহের কাছে। তবু তাতে শেষ রক্ষা হয় নি। তাঁর পরম স্নেহ পুত্তলিকাটি কেড়ে নিয়ে যেন নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে প্রকৃতি। কাহিনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন, সন্ন্যাসী প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে অসীম অনন্তকে বিশুদ্ধভাবে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে লক্ষ্য অর্জিত হয় নি। এ জগৎ-সংসারের সীমায়িত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যেই অসীমের সন্ধান পাওয়া যায়। এ তত্ত্বটি রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩)-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। কবির অন্তর গুহায় হঠাৎ বিশ্বের আলোক প্রবেশ করে কিভাবে কবিকে জগৎ সংসারের অপূর্ব লীলার মধ্যে টেনে আনল তা এ কবিতায় উচ্ছ্বাসময় ছন্দোরূপ পেয়েছে। তখন থেকেই তিনি জীবন ও জগতের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে অসীম ও অনন্তের প্রকাশ লক্ষ্য করতে থাকেন। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, শত্রুতা-বন্ধুত্ব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মত আপাত তুচ্ছ ঘটনায়ও তিনি খুঁজে পান সেই অনন্তের ছবি। তাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও সন্ন্যাসীকে সংসারের বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করানোর জন্য বেশ কয়েকটি জনতা দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর প্রভাবেই যেন সন্ন্যাসীর মনে সূচিত হয়েছে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। 'জীবনস্মৃতি' রচনার এক স্থানে কবি এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন :

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল। এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে আমার সমস্ত কাব্য রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। ...এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।[৫]

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে সচেতন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব রূপায়ণ করার চেষ্টা রবীন্দ্র-নাটকে এই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। তাই কোন কোন রবীন্দ্র-সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও প্রমথনাথ বিশী 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্ব নাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[৬] আবার অজিত কুমার ঘোষ ও আশুতোষ ভট্টাচার্য এ নাটককে চিহ্নিত করেছেন কাব্যনাটক হিসেবে।[৭] বস্তুত, নাটকের প্রধান অংশ কাব্যে ও গানে রচিত হলেও জনতা-দৃশ্যসমূহ সরস জীবন্ত গদ্যে রচিত। তাই আঙ্গিক বিচারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে বিশুদ্ধ কাব্যনাটক বলা কঠিন। ভাষারীতি যা-ই হোক না কেন, এ নাটকে যে একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করার চেষ্টা আছে তা বোধগম্য। তাই সার্বিক বিচারে নাটকটিকে তত্ত্ব নাটক বা রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের প্রথম রচনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এ নাটকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতায় রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন নাটকের মূল ঘটনাস্থান অরণ্য-গুহা-পর্বত হলেও জনতা দৃশ্যসমূহ স্থাপন করা হয়েছে লোকালয়ে। সেই সূত্রে এখানে যে সমাজ পরিবেশ কল্পিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্র বিষয়ে লেখকের অবচেতন মনে লালিত মতামতের আভাস পাওয়া কষ্টকর নয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে শোনা যায় এটি 'রামরাজ্য', যেখানে রাজা পিতা-মাতার মত প্রজার মঙ্গল সাধনে তৎপর। একটি সংলাপে আছে :

---

৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা , ১৩৯৯, পৃ.১৬৯।
প্রমথনাথ বিশী ,রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ,কলকাতা , ১৯৮৮,পৃ. ১৪৩।

৭. অজিত কুমার ঘোষ , বাংলা নাটকের ইতিহাস,৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.২৭৯। তিনি এটিকে কাব্য নাটকের পর্যায়ে রেখেও মূল্যায়ন করেছেন তত্ত্বনাটক হিসেবে।
আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৪৪-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,

কোন দুঃখ নেই প্রভু! রামরাজ্যে থাকি।[৮]

তবে এই রামরাজ্যে সবাই সমান সুখে থাকে না। এখানে ভিক্ষুক যেমন আছে তেমনি জাতপাতের সমস্যাও আছে। আবার মন্ত্রিপুত্র ভ্রমণে বের হয় চতুর্দোলায় চড়ে বাদ্য বাজনাসহ। রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দই ছাতুর ফলার হবে শুনেই জনতা আনন্দে আটখানা হয়ে যায়।

নাগরিকদের এই জীবন ব্যবস্থা যে রাষ্ট্র-কাঠামোর ইঙ্গিত দেয় তা প্রাচীন ভারতীয় সামন্ত যুগের। কবির সমসাময়িক ভারতে কিছু সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব থাকলেও উনিশ শতক ছিল মূলত ধনতন্ত্রের যুগ। সে যুগে নাটকে সামন্ত রাজ্য কাঠামো কল্পনা নাট্যকারের শ্রেণী-প্রবণতার সাক্ষ্যবাহী বলে অনুমান করা চলে। কৌতুক, প্রহসন ও সামাজিক নাট্য রচনাগুলো ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রধান নাটকগুলোতে এ প্রবণতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ , বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়েই তিনি সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র-কাঠামো পরিহার করে প্রাচীন সামন্ত সমাজ ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সমালোচক এর কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্যের নিত্যকালীন আবেদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। [৯] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একাধিক রূপক-সাংকেতিক নাটকে নিত্যকালীন সমস্যা ছাড়াও আধুনিক জীবন ও সমাজের সংকটও আলোচিত হয়েছে। তাই সমালোচকের এ ধরনের বক্তব্য সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না। বস্তুত, ভারতের প্রাচীন সমাজের প্রতি, জীবনব্যবস্থার প্রতি কবির এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কারণেই নাটকে সামন্ত সমাজ-কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। উল্লেখ্য যে, 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র জন্য সামন্ত সমাজ-কাঠামো ব্যবহার কিছুটা অপরিহার্য হলেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে তা অপ্রতিরোধ্য ছিল না।

সামগ্রিক বিবেচনায় ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক পরিবেশে রচিত নাটকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের পটভূমি ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। বিশেষত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত ভারতবাসীর কাছে উক্ত 'রামরাজ্য'-

৮.প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী ,১৩৬৩, পৃ.১৯৫।

৯.ভবতোষ দত্ত,'রবীন্দ্র নাটকের পূর্ব সূত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুলভ রাষ্ট্রীয় পটভূমি সমকালের শাসক-শোষককে যেন যবনিকার আড়ালে নিয়ে যায়। সে সঙ্গে নাটকে চিত্রিত রাজমহিমা স্বাভাবিক, সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় বিষয়টি চলে গেছে সমকালীন ব্রিটিশ রাজের অনুকূলে। অন্য দিকে নাটকের সাধারণ মানুষ যখন ভিক্ষা করে কিংবা জীবনধারণের আবশ্যিক উপাদান লাভ না করেও 'রামরাজ্যে থাকি' বলে ঘোষণা দেয় তখন তা এর চেয়ে উন্নত জীবন ব্যবস্থার জন্য উৎসাহ তৈরি করে না। ফলে সমীকরণটি দাঁড়ায় এ রকম যে, রামরাজ্যের মতো আদর্শ রাষ্ট্রেও শ্রেণীভেদ থাকবে, ধনী-গরিব বৈষম্য থাকবে। অর্থাৎ, 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নিছক একটি ভাববাদী তত্ত্ব প্রচারের নাটক থাকে নি ; তাতে রাজনীতি বিষয়ে রচয়িতার মতামতও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, তত্ত্বনাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রচয়িতার বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের আত্যন্তিকতায় রাজনীতির উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ সচেতন বিবেচনায় আসতে পারে নি বলেই মনে হয়। নইলে নাটকের কয়েকটি জনতা দৃশ্যে সাধারণ মানুষের কথোপকথন ও জীবনাচরণের যে প্রাণবন্ত ছবি উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁদের প্রতি নাট্যকারের গভীর অনুরাগের পরিচয় সুস্পষ্ট। এডওয়ার্ড টমসনের মতে :

> The best things, dramatically, in Nature's Revenge, are the conversations on the road, which are full of simple obvious humour. ...The humour, however, it may jade a subtle preception, is racy and natural; almost any group of Bengali villagers can improvise the same kind at any time, and with success.[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> গ্রাম্য জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ও পল্লীবাসীদের আলাপের কৌতুককর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত জীবন পর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়।[১১]

---

১০. Edward Thompson, Rabindranath: Poet & Dramatist, London, 1948 , p. 48.

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা ১ম খণ্ড, কলকাতা , ১৯৭১, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ ভট্টাচার্যও উক্ত দৃশ্যসমূহের সার্থকতার সূত্রে সাধারণ মানুষের জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] তাই, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের অবস্থা ও তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলার সুযোগ থাকে না।

পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) রচিত হয় সোলাপুর, পুনায়। এর মধ্যে 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ-ভারতবাসী সম্পর্ক বিষয়ে 'হাতেকলমে' প্রবন্ধ ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসের অনেকগুলো পরিচ্ছেদ এর অন্তর্গত। প্রকাশিত হয়েছে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থ এবং কিছু হেঁয়ালি নাট্য। কলকাতার 'সখী সমিতির' অনুরোধে কেবল মেয়েদের অভিনয়ের জন্য তিনি রচনা করেন গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)।

রাজনীতিতে ইতোমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় এর দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি পরিবেশন করেন। এ ছাড়া কংগ্রেস নিয়ে কবির মধ্যে তেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। তবে কংগ্রেস যে ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায় অধিবেশনসমূহে যোগদানকারীর সংখ্যা থেকে। যেমন, প্রথম অধিবেশনে যেখানে ছিল ৭২ জন , ১৮৮৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় দুই হাজারে।[১৩]

এ পটভূমিতে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি স্থান পায় নি। এর কাহিনীতে বলা হয়েছে : জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব তাঁর রাণী সুমিত্রার প্রেমের মোহে রাজকার্যে উদাসীন। রাণীর আত্মীয়স্বজন রাজ্য জুড়ে অত্যাচারের আখড়া গড়ে তুলেছে। সুমিত্রা রাজাকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেও কোন ফল হয় না। অগত্যা রাণী নিজে পুরুষের ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্য কাশ্মীর গিয়ে রাজকুমার কুমারসেনের সাহায্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এ দিকে রাণীর পলায়ন সংবাদে বিক্রমদেবের মোহ কেটে যায়, জাগে যুদ্ধের নেশা। তিনি এবার নিজেই বিদ্রোহী সামন্ত রাজাদের আক্রমণ এবং বন্দী করেন। কয়েক জন পলাতক রাজাকে রাণী

১২. আশুতোষ ভট্টাচার্য ,পূর্বোক্ত , পৃ.১৪৮।

১৩. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত , পৃ.৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পথিমধ্য থেকে ধরে নিয়ে আসেন রাজার কাছে। এতে বিক্রমদেব অপমানিত বোধ করেন। বন্দীরাও এ বিষয়ে রাজাকে উত্তেজিত করলে তিনি কুমারসেনের প্রতি হয়ে ওঠেন বিরূপ। তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বিক্রমদেব কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেন। কাশ্মীর-রাজ বিক্রমদেবকে স্বাগত জানান এবং রাজকুমারকে তুলে দিতে চান তাঁর হাতে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রজারা রাজকুমারকে লুকিয়ে রাখে। রাজকুমার কুমারসেনও উত্তেজিত হয়ে বিক্রমদেবকে আক্রমণ করতে চাইলে রাণী সুমিত্রা তাঁকে বিরত করেন এবং আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ জানান। কুমারসেন সব দিক বিবেচনা করে আত্মহত্যার মাধ্যমে বিক্রমদেবের অপমানবোধ নিরসনের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাণী সুমিত্রা একটি থালায় করে কুমারসেনের কর্তিত মস্তক নিয়ে আসেন বিক্রমদেবের কাছে। এদিকে তার আগেই কুমারসেনের বাগদত্তা স্ত্রী অমরু-রাজকন্যা ইলার প্রেমাদর্শে বিক্রমদেব মুগ্ধ হন এবং কুমারসেনের প্রতিও প্রসন্ন হয়ে ওঠেন। সে সঙ্গে পুনরায় আসক্তি অনুভব করতে শুরু করেন সুমিত্রার প্রতি। কিন্তু রাণী সুমিত্রা ভাই কুমারসেনের ছিন্ন মস্তক বিক্রমদেবকে প্রদর্শন করেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময় সেখানে অমরু-রাজকন্যা ইলা এসে পড়লে তিনিও কুমারসেনের ছিন্ন মস্তক দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

উল্লিখিত কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা হলো–জগৎসংসারের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে অন্বিত থাকলেই প্রেমে সার্থকতা আসে ; আসক্তির মধ্যে নয় । নাটকের ঘটনাপরম্পরায় রাজা বিক্রমদেবের আসক্তি-মুক্তির কথাই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ , এ নাটকের কাহিনী ও বক্তব্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই বললে চলে। আর মোহাবিষ্ট রাজা যে রাজকার্যে উদাসীন তা কাহিনী সূত্রেই জানা যায়। নাটকে বিধৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা যথারীতি প্রাচীন যুগের । তবে কৌতূহলের বিষয় হলো জনতা-দৃশ্যের কিছু উৎপীড়িত ও ক্ষুধার্ত প্রজার কথোপকথন। তারা এখানে সম্মিলিতভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে ধনীগৃহস্থের বাড়ি লুঠ করার পরিকল্পনা করে যদিও বিক্রমদেবের বয়স্য দেবদত্তের প্রভাবে বাতিল হয়ে যায় সে পরিকল্পনা। এতে বোঝা যায় যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সংগ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

ঝাঁপিয়ে পড়া যে খুবই স্বাভাবিক তা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না।[১৪] তবে এ রূপ বিদ্রোহ যে খুব একটা কাঙ্ক্ষিত নয় , তা-ও প্রকারান্তরে কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতি পরোক্ষভাবে উক্ত মনোভাবের প্রকাশ ছাড়া অপর কোন রাজনৈতিক বক্তব্য 'রাজা ও রাণী'তে দৃষ্টিগোচর হয় না। পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' রচিত হয় ১৮৯০ সালে সাজাদপুর জমিদারিতে কবির অবস্থানকালে। এ সময় ঠাকুরবাড়ির বালকেরা একটি নাটক করার পরিকল্পনা নিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সপরিবার শিলাইদহ থেকে ফিরে এলে ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ কবিকে একটি বাঁধানো খাতা দিয়ে নাটকের বায়না ধরে। এ দিকে পিতার আদেশে কবিকে জমিদারির সেরেস্তার কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য যেতে হবে সাজাদপুর। যাওয়ার সময় কবি পূর্বে লিখিত 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসের একটি কপি সঙ্গে নেন। এ উপন্যাসের অংশবিশেষ নিয়েই রচিত হয় বিসর্জন নাটক, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথাগত নাটকের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক রচনা বলে স্বীকৃত।

রাজনীতিতে এ সময় ভারতসচিব লর্ড ক্রস-এর 'Indian Councils Bill' নিয়ে উত্তেজনা চলছে। লন্ডনে হাউস অব লর্ডস-এ উত্থাপিত এ বিলে বর্ধিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার খর্ব করা হয়। এর বিরুদ্ধে লন্ডনের উদারনীতিবাদী এবং ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব তীব্র সমালোচনা শুরু করে।[১৫] রবীন্দ্রনাথও এতে বিচলিত হন এবং কলকাতায় এমারেল্ড থিয়েটারে আয়োজিত সভায় পাঠ করেন 'মন্ত্রী অভিষেক' (১৮৯০) নামে একটি প্রবন্ধ। যে সব রক্ষণশীল ইংরেজ নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রাচ্য দেশীয়দের জন্য অনুপযোগী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতামত খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মানবপ্রকৃতির মধ্যে বিরোধ থাকার এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, ভারতবাসীর কল্যাণের দায়িত্ব ভারতবাসীকে দিলে তারা অসন্তুষ্ট হবে। অবশ্য, প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজ প্রশস্তিও চোখে পড়ার মত । কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে সমকালীন রাজনীতির পরিবর্তে স্থান পেয়েছে কয়েক বছর পূর্বের

১৪. উল্লেখ্য, এই সময় থেকে ভারতে রেকর্ড ভঙ্গকারী দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল (১৮৮৯- ১৮৯২)। সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.৮৩-৮৪।

১৫. নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত ,পৃ .৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মসংস্কার। ১৮৮৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মনোনীত হওয়ার পর কবি কিছুটা কর্তব্যের তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দু মতাবলম্বীর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি ও নব্যহিন্দু দল মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মদের নিরাকার উপাসনা তত্ত্ব হিন্দুধর্ম বিরোধী। এর বিরুদ্ধে 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' (১৮৮৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, পৌত্তলিকতায় ঈশ্বরকে এক বিশেষ সীমার মধ্যে (মূর্তির মধ্যে) আবদ্ধ করে তাঁর উপাসনা করা হয়। তাঁর মতে, এ মূর্তি কল্পনার উদ্রেক করার জন্য সৃষ্টি হলেও কিছুদিন পর মূর্তির সে ক্ষমতা থাকে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং এভাবে পরোক্ষ উপায়টাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।[১৬] নব্যহিন্দু দলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিতর্ক কয়েক বছর ধরে চলেছিল বলে একজন রবীন্দ্র জীবনীকার জানাচ্ছেন।[১৭] বিতর্কের এক পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ গল্প (মুকুট) এবং একটি উপন্যাস (রাজর্ষি) রচনা করেছিলেন। 'রাজর্ষি' থেকে 'বিসর্জন' নাটক রচনা করার সময় দেখা গেল এখানেও রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর উপাসনা হিসেবে মূর্তিপূজা এবং তাঁর উদ্দেশে পশু বলি দেয়ার সংস্কার অর্থহীন এবং অমানবিক বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে তুলেছেন।

'বিসর্জনে' আছে : ত্রিপুরা রাজ্যের মন্দিরে দেবীর পূজায় পশু বলি প্রচলিত। একবার এক অনাথিনী বালিকার প্রিয় ছাগশিশু বলি দেয়া হলে বালিকা রাজার কাছে অভিযোগ করে। বিষয়টি রাজাকেও বিচলিত করলে তিনি পশু বলি নিষিদ্ধ করেন তাঁর রাজ্যে। এতে রাজপুরোহিত ও তাঁর শিষ্য এবং রাণী সবাই আহত হন। পুরোহিত ধর্মবিষয়ে রাজহস্তক্ষেপ অস্বীকার করেন। ও দিকে রাণীও সন্তান কামনায় পশুবলি দিতে উৎসাহী। কিন্তু রাজঘোষণায় তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় পুরোহিত রঘুপতি রাজভ্রাতাকে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে রাজাকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেন। ভীরু রাজাভ্রাতা তাতে অসম্মত হলে পুরোহিতের পুত্রবৎ শিষ্য জয়সিংহ একাজের দায়িত্ব নেয়। শিষ্যের মনেও রাজার মতো পশুবলি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত। তবু সে গুরুর প্ররোচনায়

১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী , ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯২, পৃ.২১০।

১৭. ঐ, পূর্বোক্ত , পৃ.২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর আদেশ প্রতিপালনে কৃতসংকল্প। রঘুপতি তাকে বোঝান যে, রাজরক্তেই দেবীর সন্তুষ্টি। এদিকে জয়সিংহ জানতে পেরেছে যে, সেও এক রাজবংশেরই সন্তান। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জয়সিংহ দেবীর সম্মুখে আত্মঘাতী হয়ে নিজের রক্তই দেবীকে নিবেদন করে। জয়সিংহের আত্মহত্যায় অকৃতদার রঘুপতির পিতৃহৃদয় হয় রক্তাক্ত। চৈতন্যোদয় হওয়ায় পুরোহিত বুঝতে পারেন, দেবীমূর্তি দেহে মনে পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাঁর উদ্দেশে পূজা তথা পশুবলি অর্থহীন। হতাশায় ও ক্ষোভে তিনি দেবীমূর্তি নিক্ষেপ করেন পার্শ্ববর্তী গোমতী নদীতে।

'বিসর্জন' নাটকের কাহিনী, উদ্দেশ্য, পটভূমি ও চরিত্র সব দিক থেকেই একক বক্তব্য উপস্থাপনে ক্রিয়াশীল ; এবং তা হলো ধর্ম সংস্কার । এতে রাষ্ট্র, রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বক্তব্য অনুপস্থিত। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে ধর্মও রাজনীতির উর্ধ্বে নয়। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম চিন্তা তাঁর পরবর্তী রচনায় (রাজা) অধিকতর সুস্পষ্ট এবং শিল্পিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'বিসর্জন' প্রকাশের পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লোকেন পালিতের লন্ডন যাত্রার সংবাদ শুনে কবিও তাঁদের সঙ্গ নেন। কিন্তু এবার লন্ডন বাস আগের মতো ভালো না লাগায় ফিরে চলে আসেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মানসী' (১৮৯০)। এর পরপরই তাঁকে জমিদারি তদারকির কাজে উত্তরবঙ্গ এবং উড়িষ্যায় যেতে হয়। উড়িষ্যা যাওয়ার পথে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে কয়েকদিন থাকার সময় (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) তিনি রচনা করেন 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের প্রথম খসড়া। এটি ১৮৯২ সালে কৌতুকনাট্য 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)-এর সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশেষ ভাবের রূপসৃষ্টি। ভাবটি হলো জৈব আকর্ষণে নয়, যথার্থ চারিত্র্য শক্তির প্রভাবে মোহমুক্ত মিলনেই প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতা নিহিত। এ বক্তব্য কবি মহাভারতের একটি আখ্যান অংশ পুনঃসৃজনের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদায় রূপ দান করেন। এর কাহিনী নিম্নরূপ :

মণিপুর রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা শৌর্যবীর্যে রাজপুত্রের সমকক্ষ। তার পোষাক পরিচ্ছদ পুরুষের মতো। দেহে নেই নারীসুলভ লাবণ্য। একবার সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী অর্জুনের প্রতি প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। অপমানিতা চিত্রাঙ্গদা দেবতার শরণাপন্ন হলে

Dhaka University Institutional Repository

দেবতা তাকে এক বছরের জন্য রূপবতী হওয়ার বর দান করেন। সে রূপের মোহে ব্রতভঙ্গ হয় অর্জুনের । সে চিত্রাঙ্গদার প্রতি অনুভব করতে থাকে প্রবল আকর্ষণ।

এ দিকে কেবল দেহজ রূপ লাবণ্যের প্রতি অর্জুনকে আত্মসমর্পিত হতে দেখে চিত্রাঙ্গদার মনে ভিন্ন চৈতন্যের উদয় হয়। তার মনে হয়, অর্জুন কেবল তার স্থূল সৌন্দর্যে মুগ্ধ , হৃদয় ঐশ্বর্যে নয় । এ ভাবে কেটে যায় এক বছর । এ সময় চিত্রাঙ্গদার পিতৃরাজ্য দস্যুদলের হুমকির সম্মুখীন হলে দেশবাসী চিত্রাঙ্গদার সাহায্য প্রার্থনা করে। জনৈক বনচারীর কাছে অর্জুন এ তথ্য জেনে চিত্রাঙ্গদার প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার বীর চিত্ত চিত্রাঙ্গদার বীরত্বব্যঞ্জক রূপের প্রতি হয়ে ওঠে শ্রদ্ধাশীল। রূপবতী চিত্রাঙ্গদাকে তার সে অনুভূতি জানিয়েও দেয় অর্জুন । অবশেষে অর্জুনের এই রূপজ মোহ পরিত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত হলে চিত্রাঙ্গদা তার স্বরূপ প্রকাশ করে। অর্জুনকে সে আহ্বান করে তাকে সুখে দুঃখে পাশে রাখার , সংকটে কিংবা উদ্বেগে সাথী করে নেয়ার ; তা হলেই সে হয়ে উঠবে স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী, কঠিন ব্রত সাধনার সহায়।

আপাতদৃষ্টিতে এ নাটকে নারী-মর্যাদার স্বীকৃতি আছে বলে মনে হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, সামন্ত কাঠামোয় মানুষের সার্বিক মুক্তির বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না । আর সমাজে নারীর অবস্থান ছিল সাধারণ পুরুষেরও এক স্তর নীচে। এ অবস্থায় এক রাজকন্যার পক্ষে পুরুষের সম মর্যাদা ভোগ সম্ভব হলেও নারীর সামগ্রিক অবস্থান সেরূপ হওয়ার উপায় ছিল না। তা সত্ত্বেও এখানে নারীর ব্যক্তিসত্তার যে জয়গান করা হয়েছে তা নাটক রচনার সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস-এর 'পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে কাঙ্ক্ষিত সমাজে নারীর যে পূর্ণ মর্যাদার ধারণা দেয়া হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীক্ষ্ণ উপলব্ধিতে তারই কাছাকাছি বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে এঙ্গেলস-এর মতানুযায়ী এর পূর্বশর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা না করে রবীন্দ্রনাথ কেবল নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। অথচ পুঁজিবাদে ব্যক্তিত্ব সৃজনের চাবিকাঠি হিসেবে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সুযোগের স্তর বিন্যাসকেই প্রধানভাবে গণ্য করা হয়।

তাই পূর্বাপর বিচারে 'চিত্রাঙ্গদা'য় সামন্ত রাজ-কাঠামো ছাড়া রাজনীতির ভিন্ন উপাদান নেই বললে চলে।

Dhaka University Institutional Repository

'চিত্রাঙ্গদা'র সমসাময়িক 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম হাস্যরসাত্মক নাটক। ইতোপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রহসন। তাঁদের রচনায় হাস্যরসের সঙ্গে ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ। সেদিক থেকে 'গোড়ায় গলদ' প্রেম-বিবাহ বিষয়ক একটি নির্ভেজাল হাস্যরসের নাটক।

নাটকের কাহিনী এ রকম : উকিল চন্দ্রকান্তের বন্ধু বিনোদ, নলিনাক্ষ, নিমাই প্রমুখ। চন্দ্রকান্তই এদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিত বলে তার বাড়িতে প্রতি রবিবার আড্ডা বসে ; বিষয় নারী এবং অবিবাহিত জীবন। এক দিন আড্ডার সময় পাশের বাড়ি থেকে তরুণী কণ্ঠের গান ভেসে আসে। বাড়িটি নিবারণ বাবুর, এবং তাঁর কন্যা ইন্দুমতী ও বন্ধুকন্যা কমল থাকে সেই বাড়িতে। নিবারণ বাবুর বন্ধু আদিত্য বাবু কমলকে বিপুল সম্পত্তি-সহ তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। অবশ্য সম্পত্তির বিষয়টি তখনো কমলকে জানানো হয় নি। নিবারণ বাবু কমলকেও ইন্দুমতীর মতোই লালন পালন করছেন। এই কমলই গান গেয়েছিল সেদিন। এ দিকে গান শুনে বিনোদ স্থির করে ফেলে যে, সে ঐ মেয়েকে বিয়ে করবে। তার প্রস্তাব নিয়ে চন্দ্রকান্ত নিবারণ বাবুর বাড়ি যায়, সঙ্গে বিনোদ ও নিমাই। প্রস্তাবটি সানন্দে গৃহীত হয়। এ দিকে আড়াল থেকে ইন্দুমতী সুশ্রী যুবক নিমাইকে দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নিবারণ বাবুর কাছ থেকে সে নিমাইয়ের কোন পরিচয় জানতে পারে না।

আবার নিবারণ বাবুর বন্ধু ডাক্তার শিবচরণ তাঁর ছেলে নিমাইয়ের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে নিবারণ বাবু সে প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। কিন্তু ইন্দু তাতে সম্মত হতে পারে না। কারণ সে তখনো নিমাইয়ের সত্য পরিচয় জানে না। তা ছাড়া, তার ধারণা , নিমাই কোন আধুনিক যুবকের নাম হতে পারে না। একদিন সে নিমাইয়ের পরিচয় জানার জন্য আসে চন্দ্রকান্তের স্ত্রী ক্ষান্তমণির কাছে। বর্ণনা শুনে ক্ষান্তমণি জানায় যে, উক্ত যুবক তার স্বামীর অপর বন্ধু ললিত চাটুজ্জে হতে পারে। এ সময় নিমাই-সহ চন্দ্রকান্ত বাড়ি এলে ইন্দুমতী পালিয়ে যায়। পালাবার সময় সে নিজেকে বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনীর মিথ্যে পরিচয় দেয়। নিমাই ইন্দুকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার মিথ্যে পরিচয়ই ধরে নেয় সত্য বলে। ও দিকে অসচ্ছলতার কারণে বিয়ের কিছুদিন পর

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদ কমলকে পুনরায় নিবারণ বাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এবার নিবারণ বাবু কমলকে তার বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়ে দেন। সেই টাকায় কমল একটি বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছদ্ম পরিচয়ে তার উকিল নিয়োগ করে বিনোদকে। সব সময় আড়ালে থাকায় বিনোদ কমলকে চিনতে পারে না। এক পর্যায়ে বিনোদ-কমল ও নিমাই-ইন্দুমতীর পরিচয় জটিলতা ঘুচে যায় এবং আনন্দিত চিত্তে তাদের মিলন ঘটে।

'গোড়ায় গলদ' নির্ভেজাল হাস্যরসের নাটক হলেও তাতে পরোক্ষভাবে নাট্যকারের সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজের নারী পরিস্থিতি যেন লেখকের অনুমোদনক্রমেই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, কমল ও ইন্দুমতীর বিয়ে স্থির হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের মতামত গ্রহণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় নি। অর্থাৎ ছেলেরা মেয়ে পছন্দ করার সুযোগ পাচ্ছে, পক্ষান্তরে মেয়েরা নির্বিচারে মানতে বাধ্য হচ্ছে অভিভাবকের নির্দেশ। আবার বিয়ে করার জন্য ছেলেদের যেভাবে উদ্যোগী দেখানো হয়েছে, মেয়েদেরকে সে ভাবে দেখানো হয় নি। যেমন, শুধু গান শুনে বিনোদ বিয়ে করতে চেয়েছে কমলকে। অথচ ইন্দুমতী নিমাইকে পছন্দ করলেও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তার প্রকাশ সে ঘটাতে পারে নি। এমন কি অপরিচিত যুবকের দৃষ্টিগোচর হওয়াও নারীর জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল , এমন মতও এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এ সবকে সামন্ত মূল্যবোধজাত মনোভঙ্গির প্রকাশ বলার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, যেখানে নারী-ব্যক্তিত্ব হয় অস্বীকৃত। অন্যদিকে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের সার্বিক মুক্তির বিষয় উক্ত পরিস্থিতিতে অভাবনীয় বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সামন্ত যুগের পশ্চাৎপদ সমাজদৃষ্টি লক্ষ্য করা গেলেও ধনবাদী সমাজ বৈশিষ্ট্যের অর্থসর্বস্বতার উপাদানও এতে রয়েছে। যেমন, আইন ব্যবসায়ী বিনোদ তার ধনী মক্কেল কমলের পরিচয় জানতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। তার চোখে পড়ে না তারই স্ত্রীর এবং মক্কেলের নামের মিলটুকু। এমন কি আড়াল থেকে কথা বললেও স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও সে চিনতে ব্যর্থ হয়। বিনোদের এ অর্থ-সর্বস্ব একাগ্রতা বস্তুত বর্তমান ধনবাদী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। এ উপস্থাপনা নাট্যকার সচেতনভাবে করতে না চাইলেও তাঁর সমাজ পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে এ উদ্দেশ্যে চালিত করেছে বলে ধরে নেয়া যায়। 'গোড়ায় গলদ'-এর কাহিনী কবি পরবর্তী সময় আবার লেখেন 'শেষরক্ষা' নামে।

Dhaka University Institutional Repository

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ'-এর চার বছর পর একটি বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে রচিত হয় 'মালিনী' (১৮৯৬) কাব্য নাটক। এই কয় বছরে কবির হাতে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচিত হতে দেখা যায়। যেমন, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী ,'ইংরেজের আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার' , 'রাজা ও প্রজা', 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি। উক্ত প্রবন্ধসমূহে তিনি ইংরেজ জাতি, এ দেশবাসীর প্রতি ইংরেজের ব্যবহার, এমন কি আফ্রিকায় ইংরেজের সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসন-শোষণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। এর মধ্যে 'ইংরেজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় ইংরেজ কর্তৃক সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অন্যায়ভাবে দমনের বিরোধিতা। আর 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজের অত্যাচারের রীতিমতো প্রতিশোধ নেয়ার ইন্ধন যুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে।[১৮]

এ সময় রচিত কয়েকটি কবিতায়ও নিপীড়িত জনতার প্রতি তাঁর সমমর্মিতা দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। 'চিত্রা' কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে', 'চৈতালি'র 'দুই বিঘা জমি' এ গুলোর মধ্যে অন্যতম। 'চৈতালী'র আরও কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক রাজনীতি-চিন্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। যেমন 'স্নেহগ্রাস', 'বঙ্গমাতা', 'অভিযান', 'পরবেশ' ইত্যাদি কবিতা। উক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলোতে রাজনীতির কিছু কিছু আলোচনা থাকলেও এ সময় রচিত নাটক 'মালিনী'তে তার আভাস পাওয়া যায় না। বরং জীবন চেতনার একান্ত কিছু অনুভবই যেন ব্যক্ত হয়েছে এ সব কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে।

সংক্ষেপে মালিনীর কাহিনী হলো : কাশীরাজ-কন্যা মালিনী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ-এর কাছে সর্বজীবে প্রেম, মৈত্রী ও করুণার ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাজ্যের জনতা এর

---

১৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী , ১৩৯৩, পৃ. ৪১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার নির্বাসন দাবী করে। কিন্তু মালিনী প্রজাদের অন্তরে তার ধর্মের যথার্থ বাণী পৌঁছে দিলে জনসাধারণও গ্রহণ করে নেয় নতুন ধর্ম। সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর দুই বন্ধু। সুপ্রিয় মালিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার ধর্মাদর্শও গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষেমংকর চিরাচরিত ধর্ম বিসর্জন দিতে নারাজ। সে বরং বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মালিনীর পিতার রাজ্যে প্রবর্তিত নতুন ধর্ম উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বন্ধুত্বের সুবাদে সুপ্রিয় এ ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যায় এবং তা ফাঁস করে দেয় রাজার কাছে। এতে ক্ষেমংকরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং সে ধরা পড়ে। বন্দী ক্ষেমংকরকে তার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করতে বলা হলে সে আগ্রহ জানায় প্রিয় বন্ধু সুপ্রিয়কে দেখার। সুপ্রিয়কে আনা হয ক্ষেমংকরের কাছে। এ সময় আলিঙ্গন করার ছলে ক্ষেমংকর অকস্মাৎ লোহার শেকলের প্রচণ্ড আঘাতে সুপ্রিয়কে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয়। প্রিয়তমের আকস্মিক মৃত্যুতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মালিনী। কিন্ত জ্ঞান হারানোর আগে উচ্চারণ করে 'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে'।

চার দৃশ্যের এ কাহিনীতে মালিনীর ধর্মাদর্শ সর্বজীবে প্রেম, করুণা ও অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করলেও এখানে মূলত কবির 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পর্যায়ের অনুভূতিই যেন প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। এর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা – বিষয় সংসার ত্যাগ – এই ভাবের মিল নেই। তাই ধর্মগুরু কাশ্যপের আশীর্বচন মালিনীর জীবনাচরণের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে দেখা যায় না। প্রথম দৃশ্যে কাশ্যপ বলেছিলেন :

... ... ত্যাগ করো সুখ-আশা
দুঃখ ভয় ; দূর করো বিষয় পিপাসা;
ছিন্ন করো সংসার বন্ধন ; পরিহর
প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা ; চিত্তে ধরো
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রভার আলোক
রাত্রিদিন – মোহশোক পরাভূত হোক । [১৯]

সেই মালিনীর মনেই প্রিয় বিরহিতা রমণীর বেদনার প্রতিভাস পাওয়া যায় চতুর্থ দৃশ্যের

১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ঐ, পৃ.১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সংলাপে :

ওরে রমণীর মন,
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায় ? [২০]

রাজার একটি স্বগতোক্তিতেও মালিনীর মানস প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে :

রাজা । ... ... বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল – দেবী নারে, দয়া নারে,
ঘরের সে মেয়ে। [২১]

বিশেষ করে, সুপ্রিয়র প্রতি মালিনীর প্রেমভাবের জাগরণে , সুপ্রিয়র সঙ্গে পরিণয়ে সম্মত (পিতার সংলাপে) মালিনীর মধ্যে চিরকালীন প্রেমিকার লজ্জামূর্তির আবির্ভাব – এ সবের মাধ্যমে তাকে পুনরায় সাংসারিক মায়াময় মানবিক জগতে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত। আর পুরস্কার স্বরূপ মালিনীকে সুপ্রিয়র হস্তে সমর্পণের সুখ-সম্ভাবনার সময় সুপ্রিয়র মৃত্যু মালিনীর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে দিয়েছে। এ দিক থেকে ঘটনাটি প্রায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মতো। মালিনী নাট্যের সূচনায় কবি নিজেও সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন :

> সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।
>
> আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতঃই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ;এরই যা দুঃখ, এর-ই যা মহিমা

২০. ঐ, পৃ. ১৭০।

২১. ঐ, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ, সে কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়। (মালিনী,সূচনা অংশ) [২২]

এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন সমালোচক মালিনীর শেষ সংলাপের – 'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে' - তাৎপর্য নিয়ে মতান্তর প্রকাশ করেছেন ।[২৩] বস্তুত , এটি মালিনীর অহিংসা এবং সর্বজীবে প্রেমভাব-জাত মনোভঙ্গি। ক্ষেমংকরের প্রতি নবোদগত 'প্রেমভাব' তো নয়-ই 'শেষ মুহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি 'ও নয়।

সে যাই হোক, 'মালিনী'-র কাহিনী এবং উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যে, এ নাটকে রাজনীতি বিষয়টি গুরুত্ব পায় নি।

মালিনী-র পরের বছর রচিত হয় 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) নামে একটি হাস্যরসের নাটক। এর কাহিনীতে আছে : বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বড় ভাই বৈকুণ্ঠ সংসার অনভিজ্ঞ খেয়ালী মানুষ। সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় সময় অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও তাঁর দক্ষতা সংসার জ্ঞানেরই মতো। তাই নিজের রচনার খাতা থেকে কাউকে কিছু শোনাতে পারলে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি। ছোটভাই অবিনাশ বেতনের টাকা পুরোটাই বৈকুণ্ঠের হাতে দিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খরচ করে। বয়স চল্লিশের কোঠায় হলেও অবিনাশ এখনও অবিবাহিত। আর বিপত্নীক বৈকুণ্ঠের রয়েছে এক বিধবা কন্যা নিরু।

কেদার একজন প্রবঞ্চক দুষ্টবুদ্ধির মানুষ। তিনকড়ি তার সহচর। কেদার তার শ্যালিকাকে অবিনাশের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে বৈকুণ্ঠের খাতা পাঠের শ্রোতা সাজে। চীনা এক দোকানদারের হিসেবের খাতাকে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি হিসাবে চালিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। তিনকড়ি এ সব কাজে কেদারকে সাহায্য করলেও সে ঠোঁটকাটার মতো কেদারের সমালোচনা করতে ছাড়ে না। এক পর্যায়ে অবিনাশকে কেদার তার শ্যালিকাকে দেখায় এবং অবিনাশ তাকে পছন্দও করে। বিয়ের

---

২২. ঐ, (মালিনী, সূচনাংশ)।

২৩. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত , পৃ.৬১-৮৩।

নীহাররঞ্জন রায় , রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ.২৯২-২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পর কেদার আত্মীয়তার সূত্রে বৈকুণ্ঠের বাড়িতে এসে ওঠে। সঙ্গে নিয়ে আসে অনেক কুটুম্ব। তারা বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের কন্যা নিরু সবাইকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, বৈকুণ্ঠের ঘর ছাড়ার উপক্রম ঘটে। ও দিকে কেদারের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া নিরুর গায়ে হাত তোলে। শেষ পর্যন্ত সব জানতে পেরে অবিনাশ কেদারসহ তার সব আত্মীয়কে তাড়িয়ে দিলে ঘরে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে।

উদারহৃদয় সরল অকপট সাহিত্য বাতিকগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ এবং স্বার্থবাদী প্রবঞ্চক কেদার কর্তৃক বৈকুণ্ঠকে প্রতারণা, তিনকড়ি কর্তৃক ফাঁকে ফাঁকে কেদারের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয়া – সব মিলিয়ে নাটকের হাস্যরস বেশ জমে ওঠে। আবার কেদারের অবিবেচক আত্মীয়-স্বজন বৈকুণ্ঠকে যার-পরনাই বিব্রত করে তুললে নাটকে করুণ রসেরও মিশ্রণ ঘটে। এ ভাবে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' একটি বিমিশ্র হাস্যরসের নাটক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে রাজনীতির সঙ্গে এ নাটকের সংশ্রব খুব একটা নেই।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' রচনার পর রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন (১৯২৩ সাল পর্যন্ত) আর প্রথাগত নাটক রচনা করেন নি। এ সময় তিনি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেন বাংলা নাটকের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ধারা [২৪] রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনায়। ১৯০৭ সালে তাঁর রচিত 'শারদোৎসব ' এর মাধ্যমে এই ধারার সূত্রপাত ঘটে।

১৯০৭ সালে 'হাস্যকৌতুক' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামের দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যের সংকলন প্রকাশিত হয় । স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত এ সব নাট্যকণিকায় স্বভাবতই প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

'শারদোৎসব' নাটকটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের ঋতু-উৎসব পালন উপলক্ষে। তাই এখানেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রতিফলন নেই বললে চলে। তবে তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রেক্ষাপটে নাটকের কাহিনী এবং চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কিছু পরোক্ষ প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আর এ প্রভাব প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাজশক্তির মহিমা প্রচারের কাছাকাছি চলে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

---

২৪. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত , পৃ.৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৮) নাটকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব কোথাও কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, নাটকের স্বেচ্ছাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের মধ্যে ব্রিটিশের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। আবার সে রাজাকে খাজনা দিতে অস্বীকৃত মাধবপুরের প্রজাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহের প্রতিফলন অনেকখানি স্পষ্ট। আর কৃষকদের অহিংসবাদী নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে পাওয়া যায় গান্ধীর ছায়া, যদিও তখন পর্যন্ত অহিংসবাদী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন নি। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা হিসেবে তখন তাঁর খ্যাতি সারা ব্রিটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও অহিংসবাদী কৃষক নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী সংযত করে রাখে মারমুখী কৃষকদের। ফলে স্বৈরাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্যায় নিপীড়নের কোন সুষ্ঠু প্রতিকার নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটি একটি হতাশাব্যঞ্জক শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৯১০ সালে রচিত 'রাজা' অধ্যাত্মভাবের নাটক বলে তাতে রাজনৈতিক বক্তব্য অনুপস্থিত। অবশ্য কাহিনী বিন্যাস করতে গিয়ে এখানে কিছু অসুখী প্রজার কথা এসেছে যারা রাজার ঐহিক কর্তব্য সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। রাজার প্রতিনিধি ঠাকুরদার কাছে এ সব অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। এতে ধারণা করা চলে যে, আধ্যাত্মিক বক্তব্যের নাটক 'রাজা'য় বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাবলী হয়তো কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক নাটকের মধ্যে 'অচলায়তন' (১৯১১) সংস্কার বিরোধিতার ক্ষেত্রে অনন্য। বর্ণে বিন্যস্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজকে নাট্যকার অচলায়তনের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে যুক্তিহীন সংস্কার এবং মন্ত্রের অনুশাসনে প্রাণধর্মের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, অপরাপর মানবগোষ্ঠীকেও তারা অপবিত্র ও ঘৃণ্য ভেবে দূরে সরিয়ে রাখে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে বিধাতার সৃষ্টিলীলা এবং সকলে মিলে তাঁর সাধনাতেই পরম সিদ্ধি – নাটকের এ তত্ত্ব এরা বিস্মৃত। একদিন তাদের গুরু সেই ঘৃণ্য সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়েই অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে প্রবেশ করে। ফলে তাদের যুদ্ধ বেধে যায় আশ্রমিকদের সঙ্গে। যুদ্ধে জয় হয় গুরুর সৈনিকদেরই। এতে আশ্রমিকদের ভেদবুদ্ধি যায় ঘুচে। সবার মিলনে

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্ম সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

'অচলায়তন' নাটকের মূল লক্ষ্য বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজের সংস্কারচিন্তা হলেও এর মধ্যে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের যে উত্থান ঘটেছে তা কবির মানবিক চেতনার শৈল্পিক অভিব্যক্তি বলে বিবেচনা করা যায়। নিম্নবর্গের মানুষের যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণীর পরাজয় ও পতন রবীন্দ্র নাটকে খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় নি। রক্তপাত ও যুদ্ধ বিরোধী-সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের নীতি বিরোধী ও অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের এ উপাদান ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাহিনী-বিন্যাসে যৌক্তিক পরিণতি আনতে গিয়ে এ উপাদান তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টিকে তাঁর অনন্য শিল্পীসত্তার উদ্ভাসন বলে স্বীকার করতে হয় যা কবির দার্শনিক এবং শ্রেণী অবস্থানজাত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্ব-বিরোধিতা সৃষ্টি করে।

একই বছর রচিত 'ডাকঘর' (প্রকাশ ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি শিল্প-সফল সাংকেতিক নাটক। নাটকে একটি রুগ্ন অসহায় বালকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীম অনন্তলোকে মুক্তি পাওয়ার তত্ত্ব রূপায়িত হয়েছে। এ রূপায়ণে পরিমিতি এবং শৈল্পিক সংযম লক্ষণীয়। সাংকেতিকতার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এ নাটকে পারলৌকিক জীবনের চেয়ে সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি যেন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর পরে পরিপূর্ণ মুক্তি ও শান্তির সংকেতে নাটক শেষ হলেও বাস্তব মৃত্যুই এখানে সৃষ্টি করেছে এক গভীর বেদনাবোধ। ফলে 'ডাকঘর' নির্বাণ চিন্তার নাটক হওয়ার পরিবর্তে ঐহিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মানবিকতা বিমূর্ত বলে মনে হলেও তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এ বড় কম পাওয়া নয়।

'ডাকঘর' রচনার পর কবি কয়েকজন আত্মীয়সহ বৃটেন ও আমেরিকা ঘুরে আসেন। ইতোমধ্যে ইংরেজিতে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' (১৯১৩) ইংল্যান্ডে ব্যাপক আলোচিত হয়। সে সঙ্গে 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকের ইংরেজি অনুবাদও মঞ্চস্থ হয় ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। স্মর্তব্য, ১৯১৩ সালেই কবি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকায় 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র'

Dhaka University Institutional Repository

গল্প লিখলে তাতে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরের বছর শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের বসন্ত উৎবের উপযোগী করে লিখলেন গীতবহুল 'ফাল্গুনী'(১৯১৫) নাটক। এখানে একদল ছেলে বুড়োর সঙ্গীত ও নৃত্যে নাটকের ভাব নবীনের বন্দনা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এ নাটকে কোন তীক্ষ্ণ সংঘাতের চিত্র নেই ; একই সঙ্গে নেই রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তা এবং রাজনীতিসম্পৃক্ত কোন বিষয়।

রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এর পরবর্তী 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে। ধারণা করা চলে, এ সময় ভারতসহ সারা পৃথিবীতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তারই অভিঘাত পড়েছে উক্ত নাটকে। বিশেষত, প্রথম মহাযুদ্ধকালীন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭), যুদ্ধোত্তর ইউরোপে কয়েকটি নতুন দেশের অভ্যুদয়, সর্বোপরি ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী স্ব-রাজ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড এবং শ্রমিক কৃষকের ধর্মঘট ও কর-বন্ধ আন্দোলনের প্রভাবে রবীন্দ্র নাটকে এ পরিবর্তন আসতে পারে।

এ নাটকে দুটি রাজ্য কল্পিত হয়েছে : উত্তরকূট ও শিবতরাই। শিবতরাই নিয়ন্ত্রিত ও শোষিত উত্তরকূট দ্বারা। উত্তরকূটের শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে শিবতরাই থেকে খাজনা আদায় এবং উৎপন্ন ফসল বাধ্যতামূলকভাবে উত্তরকূটে বিক্রি করা । শুধু তাই নয়, শিবতরাইবাসীকে স্থায়ীভাবে উত্তরকূটের মুখাপেক্ষী করে রাখার জন্য উত্তরকূট থেকে শিবতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতেও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অনিবার্যভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে শিবতরাইবাসীরা। তারা প্রতিবাদ জানাতে উত্তরকূটে এসে সমবেত হয়। এক পর্যায়ে শিবতরাইবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল রাজপুত্র অভিজিতের প্রচেষ্টায় বাঁধটি ধ্বংস হয় কিন্তু সেই সঙ্গে সলিল সমাধি ঘটে রাজপুত্রেরও।

এই পরিকল্পনায় শিবতরাই যেন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের প্রতীক। এমন কি একজন অহিংস নেতার নেতৃত্বে শিবতরাইবাসীদের যে সংগ্রাম দেখানো হয়েছে তাতে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির বিখ্যাত নেতা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। ফলে, স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল যে, 'মুক্তধারা' নাটকের বক্তব্যে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতির

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কিন্তু নাটকের পরিণতিতে শিবতরাইবাসীর সংগ্রামের প্রত্যক্ষ চিত্র নেই। বরং উত্তরকূটের সহানুভূতিশীল রাজকুমারের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে বাঁধটি। এর ফলে শিবতরাইবাসীর খাজনা প্রদান বন্ধ হলো কি না তার নিশ্চিত চিত্র পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'মুক্তধারা' নাটকের বক্তব্য যেতে পারে নি আকাঙ্ক্ষিত ইতিবাচকতার দিকে। কোন কোন সমালোচকের মতে, নাট্যকারের শ্রেণী অবস্থানজাত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবই এ সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী। [২৫]

পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী' (১৯২৬) রূপক-সাংকেতিক ধারার নাটকের মধ্যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বরাবরের মতো এ নাটকেও রাজনীতি প্রত্যক্ষ বক্তব্য হিসেবে আসে নি, কাহিনীর গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যতীত উপরিতলের বিন্যাসে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাতে বর্তমান ধনবাদী সমাজের বিমানবিক পরিস্থিতি এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর বিদ্রোহের ইঙ্গিত পরিস্ফুট।

কাহিনীতে দেখা যায় : যক্ষপুরীর খনি থেকে সোনা তুলে আনার জন্য নিয়োজিত হয়েছে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। প্রচণ্ড পরিশ্রমেও তাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি হয় না। উপরন্তু কর্তব্যে কোন অবহেলা ও শারীরিক অক্ষমতা দেখা গেলে কিংবা তারা কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করলে মেলে কঠিন শাস্তি। এ ব্যবস্থায় এক দিন রাজার হাতে শ্রমিক নেতা রঞ্জনের মৃত্যু হলে খনি শ্রমিকরা রাজার প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। সে সঙ্গে ধর্মীয় পুরোহিতরা যে ধর্মের দোহাই দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণমূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে তার স্বরূপও শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়। এ সব বিবেচনা করে এবং রূপকত্বটুকু এড়িয়ে গেলে 'রক্তকরবী' নাটককে অনায়াসে শ্রেণী-শোষণ বিরোধী নাটক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে, সে দিক থেকে কিছু তত্ত্বগত ত্রুটিও এখানে রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন, স্বর্ণ আহরণে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর রাজার হয়ে যারা অত্যাচার নিপীড়ন চালায় তাদেরই এ বিদ্রোহের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন কি রাজা স্বয়ং যোগ দিয়েছে সে বিদ্রোহে। শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক উত্থানের লক্ষ্য থাকে

---

২৫. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার:তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃ.৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন যন্ত্রের মালিক বা পুঁজিপতিকে উচ্ছেদ করা। সে ক্ষেত্রে পুঁজিপতি স্বয়ং (এখানে রাজা) এ বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে না। বোধ করি, রাজার অন্তরাত্মার দ্বন্দ্ব এবং মুক্তি দেখাতে গিয়ে নাট্যকার এ তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। বিশেষত, 'রক্তকরবী'র ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন, রাজা একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। এ ত্রুটি ব্যতীত বলা চলে 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত উত্থানকে নিরঙ্কুশভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।

পরবর্তী 'রথের রশি' (১৯২৩) নাটকেও যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে নিম্নবর্গের মানুষ (শূদ্র)। মহাকালের রথ সমাজের উঁচু স্তরের কারও সাহায্যে চলছে না। ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য সবাই একে একে রথ চালাতে ব্যর্থ। অবশেষে তাদের উপেক্ষিত ঘৃণিত শূদ্ররা এসে রথের রশি ধরার সঙ্গে সঙ্গে রথ চলতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত কবি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা ধনপতিরা তাদের আভিজাত্যে শূদ্রদের উপেক্ষা করতে শুরু করেছিল। ফলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্পর্ক হয়েছে বিনষ্ট। চলার ছন্দও নষ্ট হয়েছে বন্ধুর পথের প্রতিবন্ধকতায়। মাহকালের রথ তার গতি ও ভারসাম্য ফেলেছিল হারিয়ে। আজ সেই মহাকাল ঝুঁকেছে উপেক্ষিতদের দিকে। ফলে ভারসাম্যহীনতা ঘুচে গিয়ে চলার ছন্দ পুনরায় ফিরে এসেছে। রথও চলছে তাই পূর্ণ গতিতে। অবশ্য সে সঙ্গে কবির সতর্কবাণীও শুনতে পাওয়া যায়: 'যদি এরাও ক্ষমতার মদগর্বে মাতোয়ারা হয়ে চলার ছন্দ বিনষ্ট করে তা হলে আসবে আবার উল্টো রথের পালা'। কবির সংশয়, শূদ্ররা যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয় যে, নির্বিঘ্নে সভ্যতার রথ চালাতে পারবে।

'রথের রশি'র সঙ্গেই প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র নাটিকা 'কবির দীক্ষা'। এটি নাটকাকারে দু'জনের সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি তত্ত্বের রূপায়ণ মাত্র। জীবনের ঐশ্বর্য সঞ্চয় শুধু ভোগের জন্য নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়ে তার সার্থকতা, এটি হলো এ নাটকের মর্মকথা। এ বক্তব্যে স্পষ্টত কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ইহলোকের জীবনকে। ভারতীয় ধর্মসমূহের এ বাণী বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষ যে নিজেরা বিলাসবহুল ঐহিক জীবন উপভোগ করে এ দর্শনের আড়ালে, তা রবীন্দ্রনথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মূলত ভাববাদ প্রসূত এ পারলৌকিক দর্শন প্রকারান্তরে বিদ্যমান সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতায় যা উপস্থাপন করেছেন তা বঞ্চিত মানুষের পরিপূর্ণ সহায়তায় অপারগ।

'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক নাট্যপর্ব এক প্রকার শেষ হয়ে যায়। একজন সমালোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার চূড়ান্ত পর্বও সমাপ্ত হয় এর সঙ্গে।[২৬] বস্তুত, পরবর্তী রবীন্দ্র নাটকগুলোতে শিল্প সৌন্দর্যের দীপ্তি নির্বাপিত প্রায়। এর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) নাটকে।

'গৃহপ্রবেশ' রচনার আগে কবি চীন,জাপান এবং দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে আসেন। এ সময় তিনি স্বৈরাচারী শাসক মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি সফর করে দেশে-বিদেশে পড়েন বিব্রতকর অবস্থায়। মুসোলিনী সম্পর্কে তাঁর কিছু প্রশংসামূলক মন্তব্য ইতালির পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে মর্মাহত হন বিশ্বের শান্তিকামী বুদ্ধিজীবী এবং কবির শুভাকাঙ্ক্ষীরা। অবশ্য পরে কবি তাঁর ভুল স্বীকার করে বিবৃতি দেন। দেশে ফিরে 'শেষের রাত্রি' নামের একটি গল্প তিনি রূপান্তরিত করেন 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে। এতে বলা হয়েছে : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যুবক যতীন সারাদিন শুয়ে থাকে। বোন হিমি ও মাসী তার সেবা করলেও স্ত্রী মণি ধারে কাছে ঘেঁষে না। এমন কি হিমি ও মাসী উভয়ে মণিকে যতীনের ঘরে যাওয়ার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। অথচ যতীন মনে-প্রাণে কামনা করে মণির উপস্থিতি। অগত্যা হিমি ও মাসী যতীনকে বোঝায় যে, ডাক্তার নিষেধ করেছে বলেই মণি রোগীর ঘরে আসে না । যতীনও উদার হৃদয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করে স্ত্রীর বীতস্পৃহা। এ দিকে যতীন স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসায় মণিসৌধ নামে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করে পুরনো বাড়ী বন্ধক রেখে। নতুন বাড়ির বিভিন্ন সাজসজ্জা সে যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করে মণির পছন্দমত। কিন্তু গৃহ প্রবেশের আগে তার স্ত্রী পিত্রালয়ে চলে গেলে সে নিদারুণ সত্যটি বুঝতে পারে। অন্য দিকে, দেনার দায়ে হাত ছাড়া হয়ে যায় নতুন বাড়িও। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্ত্রী মণি এসে তার পায়ে পড়ে। কিন্তু তখন সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই।

২৬.আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে, অসুস্থ যতীন কর্তৃক স্ত্রীর ভালোবাসা ও সেবা চাওয়া এবং তার অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনা এ নাটকের মূল কথা। এর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যার যোগ সামান্য। কারণ মণি শেষ পর্যন্ত যে গৃহে প্রবেশ করেছে সেখানে যতীন নেই ; এমন কি সেই গৃহও আর তাদের নয়। তা ছাড়া , মণির চিত্ত পরিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্র না থাকায় তার গৃহে প্রবেশটাই হয়ে উঠেছে আকস্মিক। আবার মণির সাহচর্য না পাওয়ার ফলে যতীনের চিত্ত-বিক্ষোভ মাসী ও হিমির কর্মতৎপরতায় এবং স্বয়ং যতীনের উদারতায় দানা বাঁধতে পারে নি। ফলে কোন প্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এ নাটকে প্রায় দুর্লক্ষ্য। তা কেবল যতীনের অন্তরতলের বিষয় হিসেবে থেকে গেছে। এ সব কারণে নাটকটি আকাঙ্ক্ষিত শিল্প সফলতা অর্জনে সমর্থ হয় নি।[২৭] রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় , নাট্য ঘটনার সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের সমস্যার যোগ নেই । স্ত্রীর সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বাড়ি নির্মাণ করেও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি সমাজের বিশেষ একটি স্তরের মানুষের একান্ত দাম্পত্য সমস্যা হিসেবেই প্রতিভাত হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ শ্রেণীর মধ্যে মানবিকতার চেয়ে অর্থ বিত্তের আকাঙ্ক্ষাই যে প্রবল তা-ও উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে। যেমন, ঋণশোধে ব্যর্থ মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের বাড়ি দখলের জন্য তারই আত্মীয়ের উৎকণ্ঠায় ধনবাদী সমাজের প্রধান বিকার যেন উপস্থিত। এটি নিঃসন্দেহে কবির সামাজিক চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ।

নারী পরিস্থিতি বিচারে এ নাটকে কবির একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, যতীন তার স্ত্রীকে যে আদর্শে কল্পনা করেছে তাতে রয়েছে এ অঞ্চলের সনাতন সেবাপরায়ণা নারী প্রকৃতির রূপ। যতীনের জীবদ্দশায় সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি না হলেও শেষপর্যন্ত মণিকে তার চরণেই সমর্পিত হতে হয়েছে। বিষয়টিকে নাট্যকারের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এক ধরনের প্রকাশ বলে অভিহিত করা চলে।

প্রায় একই সময় 'শোধবোধ' (১৯২৫) নাটক রচিত হয় 'কর্মফল' নামের গল্পের ভিত্তিতে। নাটকের বিষয় হিসেবে এসেছে বাঙালির সাহেবিয়ানা অনুকরণ ও মিথ্যা আভিজাত্যবোধ। এর কাহিনীতে আছে : মন্মথ রায়ের যুবকপুত্র সতীশ ইংরেজ-সংস্কৃতি

২৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত ,পৃ.৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুকরণে অভ্যস্ত লাহিড়ী পরিবারের কন্যা নলিনীর অনুরক্ত। সামর্থ্য না থাকলেও সে ঐ পরিবারের মতো সাহেবিয়ানা রপ্ত করার অক্ষম চেষ্টা চালায়। এ নিয়ে প্রায়ই সে সৃষ্টি করে বিব্রতকর পরিস্থিতি। অথচ তার বাবা মন্মথ রায় সতীশকে সাধারণ বাঙালি হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও নেলি(নলিনী) সতীশের সেই সহজ সরল রূপটির প্রতিই আকর্ষণ বোধ করেছিল। সে আসলে তার পিতা মাতার অন্তঃসারশূন্য সাহেবিয়ানা চর্চা পছন্দ করে না। তাই তাঁদের পছন্দের পাত্র বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার বরুণ নন্দীকে সে সূক্ষ্মভাবে তার অপছন্দের কথা বুঝিয়ে দেয়। এ দিকে হঠাৎ করে মৃত্যু হয় মন্মথ রায়ের । পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় মৃত্যুর আগে করে যাওয়া উইলে তিনি সতীশকে বঞ্চিত করেন। এ অবস্থায় সতীশ চলে আসে তার মাসী সুকুমারীর বাড়িতে। নিঃসন্তান মাসী এক সময় সতীশকে সাহেবিয়ানা অনুকরণের খরচ যোগাতেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তাঁদের পুত্র সন্তান জন্মে এবং সতীশকে ধীরে ধীরে অপছন্দ করতে শুরু করেন মাসী। এমন কি শ্লেষ কটূক্তির-মাধ্যমে সে কথা সতীশকে বুঝিয়ে দিতেও তিনি পিছ পা হন নি। মাসীর অপমানে সতীশের আত্মসম্মানবোধ জাগে এবং সে মাসীর ঋণশোধের পরিকল্পনা করে। কিন্ত ছোট চাকরিতে তাড়াতাড়ি তা করা যাবে না ভেবে সে অফিসের তহবিল তছরূপ করে শোধ করে তার ঋণ। এর পর আত্মগ্লানিবশত সতীশ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি পিস্তল নিয়ে ঢোকে বাগানে। বাগানে সে মাসীর পুত্র হরেনকে দেখে তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমন সময় মাসী এসে উদ্ধার করে হরেনকে। সে দিনই সতীশের অফিসের কর্মকর্তা পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হলে সতীশের তহবিল তছরূপের বিষয়টি উন্মোচিত হয়ে যায়। সতীশ ইতোপূর্বে সমস্ত বিষয় জানিয়ে চিঠি লিখেছিল নলিনীকে। এ অবস্থায় নলিনী এসে তার সমস্ত গহনার বিনিময়ে সতীশকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা করে।

কাহিনী নির্মাণ এবং চরিত্র চিত্রণে এ নাটকের সাফল্য প্রশ্নাতীত নয়। সতীশের ব্যক্তিত্বহীনতা , মা ও মাসী কর্তৃক সতীশকে প্রশ্রয় দান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাসীর নিম্নরুচির আচরণ, তহবিল তছরুপ করে ঋণশোধ, পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার পরিকল্পনা এবং অকস্মাৎ বালক হরেনকে হত্যা-প্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনার যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এমন কি তাতে কৃত্রিম রোমাঞ্চ সৃষ্টির চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া হত্যা

Dhaka University Institutional Repository

করতে উদ্যত হয়ে আবার মাসীকে ডেকে হরেনকে রক্ষা করার আহ্বান সতীশ চরিত্রকে অনেক খানি ভারসাম্যহীন করে তুলেছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকে কিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ্যযোগ্য। যেমন, ইংরেজ সংস্কৃতি নকল করার অন্তঃসার-শূন্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধা। আর এটি বেশ সপ্রতিভ কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নলিনী চরিত্রের সংলাপে। ব্রিটিশ শাসনামলে শাসকের কাছাকাছি হয়ে সুযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক ভারতীয় চাল-চলন এবং পোষাক-পরিচ্ছদে ইংরেজদের অনুকরণে উৎসাহী ছিল। এ আগ্রহের পেছনে বস্তুগত লাভের আশা থাকলেও এর দ্বারা নিজস্ব ঐতিহ্য , সংস্কৃতিবোধ বিসর্জন দেয়ার পাশাপাশি ছিল ব্রিটিশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাবও। তাই সচেতন ব্যক্তির পক্ষে এ অনুকরণ ঘৃণ্য বলেই বিবেচিত ছিল। শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধতায় পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল জাতীয়তাবোধের বিষয়টিও। বলা বাহুল্য , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ছিল বরাবরই ইংরেজ সংস্কৃতি অনুকরণের বিরোধী। কবি নিজেও প্রথম জীবনে এ বিষয়ে কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করে এ ধরণের বিরুদ্ধতা তুলে ধরেছিলেন। 'শোধবোধ' নাটকেও এ চেতনা সঞ্চারের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ভাবধারাই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য শিল্পগুণের দিক থেকে দুর্বল নাটকের বক্তব্য উদ্দেশ্য পূরণে সফল হতে পারে কি না তাও ভেবে দেখার বিষয়।

'শোধবোধ' রচনার পর ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে আসেন। সে সময় সফর করেন ময়মনসিংহ , কুমিল্লা ও আগরতলা। তখন কলকাতায় গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্র জীবনীকারের মতে , একটি বিশেষ রাজনৈতিক মুহূর্তে ইংরেজ গুপ্তচররা এই দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছিল।[২৮] উগ্র ধর্মবোধের এই রক্তাক্ত প্রকাশে কবি মর্মাহত হয়ে এক ভাষণে বলেন :

> আমরা না কি ধর্মপ্রাণ জাতি! তাইতো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারছে । এই কি হলো ধর্মের চেহারা ? এই মোহমুগ্ধ ধর্ম বিভীষিকার চেয়ে

২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ.২৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো ।[২৯]

এ অবস্থায় বুদ্ধের অহিংসার বাণী-সমৃদ্ধ 'পূজারিণী' কবিতাটিকে তিনি 'নটীর পূজা' নামে নাট্যরূপ প্রদান করেন। মহারাজ বিম্বিসার এবং রাণী লোকেশ্বরী বৌদ্ধ ধর্মে অনুরক্ত। রাজ উদ্যানের যে স্থানে বুদ্ধ ধ্যানস্থ হতেন রাজা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধের আসন। কিন্তু রাজপুত্র সিংহাসন লোভী হয়ে উঠলে রাজা বিম্বিসার রাজ্যপাট ত্যাগ করে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন। অপর রাজপুত্র চিত্রও ভিক্ষু হয়ে গৃহত্যাগ করলে রাণীর মনে বিরূপ ভাব জাগে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে। রাজপ্রাসাদের অন্যান্য নারীর মনেও জাগে অনুরূপ ভাব। এমন কি নিম্নস্তরের মানুষের ধর্ম বলে কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মকে বিদ্রূপও করতে থাকে। কেবল রাজবাড়ীর নর্তকী শ্রীমতীর মনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আস্থা থাকে অবিচল। রাণীর মনে বিরূপ ভাবের পাশাপাশি প্রথম জীবনের পূজা অর্চনার রেশ থেকে যাওয়ায় উভয় ভাবের দ্বন্দ্বও জেগে ওঠে। একদিন সংবাদ পাওয়া যায়, ভিক্ষু বিম্বিসার রাজপ্রাসাদে ভিক্ষা সংগ্রহে আসবেন। ক্ষুব্ধ অজাতশত্রু এই বলে ঘোষণা দেয় যে, ভিক্ষুদের পূজা ও ভিক্ষা প্রদান বন্ধ এবং দণ্ডনীয়। এর মধ্যেই শ্রীমতী পূজা দেয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রহরীরা তাকে সাবধান করে দিলেও সে থাকে সংকল্পে অটল । এমন সময় রাজার নির্দেশ আসে যেখানে শ্রীমতী পূজা দেবে সেখানেই তাকে নাচতে হবে। শ্রীমতী তাতেও স্বীকৃত হয় এবং শুরু করে নাচ। এক পর্যায়ে দেখা যায়, তার নাচ ও গানে বুদ্ধের প্রতি পূজা ও আরাধনার বাণী মূর্ত হয়ে উঠছে। এমন কি শ্রীমতী একে একে নটীর পোষাক ত্যাগ করলে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার পরনে ভিক্ষুণীর গেরুয়া চীবর। এ সব পর্যবেক্ষণ করে প্রহরী রাজ ঘোষণা অনুযায়ী শ্রীমতীকে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে মার্জনাও চেয়ে নেয় প্রহরী । রাণী শ্রীমতীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে নিজেও ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এ ভাবে শেষ পর্যন্ত নটীর বুদ্ধপূজা হয়ে ওঠে সার্থক।

'নটীর পূজা'য় সমকালীন রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তবে, এখানে যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতির জয়গান করা হয়েছে তাতে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাযুজ্য লক্ষনীয়। যেমন, নির্যাতন নিপীড়ন, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণজাগরণ এবং স্বৈরাচারীরও মানস

২৯. ঐ ,পৃ.২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন সম্ভব তা এখানে রাণী লোকেশ্বরীর ধর্মবোধে স্থিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় দেখানোর প্রয়াস আছে। বলা বাহুল্য, নাটক রচনা কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনীতিতে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ নাটকের অহিংস নীতির বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে। এ সব বিবেচনায় বলা চলে, সমকালীন রাজনীতির দ্বন্দ্ব পরোক্ষভাবে হলেও অনেকখানি ধারণ করেছে 'নটীর পূজা' নাটক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী দুটি নাটক 'তাসের দেশ' এবং 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) । মাঝখানে তিনি এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ , রাশিয়া এবং আমেরিকা ঘুরে আসেন। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শ্রমিকদের জঙ্গী ধর্মঘট এবং বিপ্লবাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামের উত্তাল পরিস্থিতি। যেমন, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ আন্দোলন ইত্যাদি। এ সময়ই ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক অংশ গ্রহণ শুরু হয় এবং তাদের পরিচালিত ধর্মঘটে দেশীয় বুর্জোয়ারাও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তখন সংযুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য। এর মধ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও যুদ্ধ, ২৩ এপ্রিল খান আব্দুল গাফ্ফার খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঠানদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং মে মাসে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে পাল্টা সরকার গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০] ব্রিটিশ সরকারও এ সব আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমনের চেষ্টা করে। কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করা হলো গান্ধীকে। সে সঙ্গে হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে দেয়া হলো কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও। একটি হিসেবে দেখা যায়, এ সময় (মাত্র দশমাসে) নব্বই হাজার আন্দোলনকারীর কারাদণ্ড হয়েছিল। [৩১] এর মধ্যে ১৯৩১ সালে হিজলির জেল হত্যাকাণ্ড কবির মনেও আন্দোলনের আগ্রহ সঞ্চার করে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক মানুষের জনসভায় ঘোষণা করেন তাঁর প্রতিবাদ ; [৩২] যদিও এ সময়ের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি

৩০. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯।

৩১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত), কলকাতা, ১৯৮৬,পৃ. ৫৩৯।

৩২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবন কথা, কলকাতা, ১৪০১,পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তিনি সাধারণভাবে দূরেই ছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর 'বৈরিতাও' ছিল স্পষ্ট।[৩৩] এ সময় 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত হয় তাঁর 'তাসের দেশ' নাটক।

'তাসের দেশে'র কাহিনীতে বলা হয়েছে: এক রাজপুত্র রাজকীয় ভোগ বিলাস এবং নিয়ম নীতির বেড়াজাল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাণিজ্য যাত্রা করে। সঙ্গে নেয় বন্ধু সদাগর পুত্রকেও। মাঝপথে নৌকাডুবি হওয়ায় তারা ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপে গিয়ে ওঠে। দ্বীপের মানুষগুলো তাস শ্রেণীর। বুকে পিঠে চৌকো । চালচলন পুতুলের মত নির্দিষ্ট। চলনের চেয়ে চালটাই যেন সব। প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও ; নেই কারও মুখে হাসি। অবস্থা দেখে হেসে ওঠে দুই বিদেশি। এ হাসিতে তাসের দেশের নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে। তাস ছক্কা বললে –'এ কী ব্যাপার। হাসি!' পাঞ্জা বলে, 'লজ্জা নেই তোমাদের, হাসি!' সে দেশের রাজা রাজপুত্রকে বলে , 'শোনো বিদেশি। ..... তোমরা তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ। জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ – এসব কেন'। রাজপুত্র বলে, 'এ আমাদের ইচ্ছে'। রাজা অবাক হয় , 'ইচ্ছে! কী সর্বনাশ!' এর পর দেখা গেল, এই ইচ্ছেটা তাসের দেশের অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। তাসিনীদের ইচ্ছে হলো মানবীর মত সাজতে। তারা দল নিয়ে যায় বকুলতলায়, নদীর ধারে , গাছের তলায় যা এর আগে ছিল অকল্পনীয়। এভাবে তাদের যাবতীয় নিয়ম ছেড়ে মানুষের স্বভাব আয়ত্ত করার চেষ্টায় রত হল সবাই। রাণী শুধায়, 'মানুষ হতে পারব আমরা ?' রাজপুত্র আশ্বাস দেয়, 'পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।'

এ কাহিনীর মাধ্যমে কবি যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা হলো , যৌবনের প্রাণাবেগে সকল জড়তা ও স্থিরতার অবসান ঘটে, মুক্তি আসে বদ্ধ প্রাণের। বস্তুত, রবীন্দ্র নাট্যধারায় এ বক্তব্য নতুন নয়। 'ফাল্গুনী' ও 'অচলায়তনে'ও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছিল। [৩৪]

'তাসের দেশ' নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ আছে বলে কেউ কেউ এটিকে নৃত্যনাট্য হিসেবে বিবেচনা করেন। বিশেষত , এটি কবির অন্যান্য নৃত্যনাট্যের সমসাময়িক এবং এর

৩৩. সুমিত সরকার পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯।

৩৪. " 'তাসের দেশ' ও 'অচলায়তনে'র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্যধারা, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপে রূপক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। তাই 'তাসের দেশ'কে রূপক-নাট্য বলাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য, কবি তখন রূপক-সাংকেতিক নাট্য রচনার যুগ পেরিয়ে এলেও এ নাটক অন্যান্য রূপক-নাট্যের মত আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম। বস্তুত, 'রথের রশি' রচনার সময় থেকেই কবির নাট্য – রূপক-সাংকেতিক শুধু নয় – রচনার দক্ষতা যেন ক্রমেই কমে আসছিল। [৩৫] সে যাই হোক, 'তাসের দেশ' নাটকে আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রকাশ নেই বললে চলে। কিন্তু সংস্কারের জড়তা থেকে, প্রথার দাসত্ব থেকে কিংবা পুরাতনের অনুবর্তন থেকে মুক্তির যে বাণী এ নাটকে রূপকের অন্তরালে উপস্থাপিত তার রাজনৈতিক আবেদন গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তৎকালীন সময় যখন ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন নিপীড়নমূলক আইন প্রয়োগ করে তীব্রভাবে আন্দোলনকারীদের দমন করতে চাইছিল, সে স্বৈরপরিস্থিতি যেন এ নাটকে তাসদ্বীপের রূপকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্রের প্রণোদনায় তাসদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহভাব যে কোন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চেতনা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কারণ কোন নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমেই যে মানুষের স্বাধীনতা স্পৃহা দমন করা যায় না এবং সমবেত প্রচেষ্টায় এ প্রতিকূলতা সহজেই অতিক্রমণ সম্ভব তা এখানে প্রকাশিত হয়েছে বেশ স্পষ্টভাবে। স্বয়ং কবির মনে যে এ ভাবনা ছিল না তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। দেখা যাচ্ছে, কবি 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করেছেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থী বলে খ্যাত নেতা সুভাষ বসুকে। তরুণ সুভাষ বসু সে সময়ে গান্ধীর অহিংস নীতি এবং চরকা কাটার বিরোধী ছিলেন এবং পরবর্তী সময় সশস্ত্র সংগ্রামপন্থী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। [৩৬]

এ বিবেচনায় বলা চলে, আপাত কাল্পনিক কাহিনীর নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ধরনের গূঢ় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রায় একই সময় রচিত 'চণ্ডালিকা' (আগস্ট ১৯৩৩)গীতিনাট্যের কাহিনী নেয়া

---

৩৫. ঐ, পৃ. ৩৭১।

৩৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.২৫৮-২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি আখ্যান থেকে। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের জীবিত কালে তাঁর শিষ্য আনন্দ এক চণ্ডাল কন্যার কাছ থেকে জল পান করেন। চণ্ডালিনী তার নিচু জাতের কথা উল্লেখ করলে আনন্দ তাকে বলেন সকল মানুষের সমান মর্যাদার কথা। এ কথা শুনে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি নিঃসঙ্কোচে ভিক্ষু আনন্দকে জল দান করে। মানব মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দের প্রতি প্রকৃতি কৃতজ্ঞ হয় এবং তাঁর সৌম্য কান্তি ও অশ্রুতপূর্ব বাণীতে হয়ে পড়ে মোহাবিষ্ট। তার মধ্যে জাগে অদম্য প্রেমস্পৃহা। এ কথা প্রকৃতি তার মাকে জানায়। প্রকৃতির মা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী। মন্ত্রবলে আনন্দকে এনে দেয়ার জন্য প্রকৃতি তার মাকে অনুরোধ করে। মা তাকে বলে যে, আনন্দ বুদ্ধশিষ্য ; মন্ত্রজাল ছিন্ন করার ক্ষমতা রাখেন তিনি। শুধু তাই নয় , মন্ত্রজাল কোনভাবে ছিন্ন হয়ে গেলে প্রকৃতির মায়েরই জীবন সংশয় দেখা দেবে। তবু প্রকৃতির পীড়াপীড়িতে তার মা শুরু করে মন্ত্র পড়া। মন্ত্রের প্রভাব কাটাতে আনন্দ মানসিক ভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হন। এ দিকে আনন্দের মানস পরিবর্তন এবং তাঁর ওপর মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে একটি মায়াদর্পণে। অবশেষে মন্ত্রের চূড়ান্ত অভিঘাতে রিপু দমনে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং ম্লান আনন্দ এসে উপস্থিত হন প্রকৃতির আঙিনায়। পরাজিত আনন্দের মধ্যে সেই সৌম্যকান্তি এবং উন্নত দর্শনের কিছুই তখন আর অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতি অনুভব করে যে, তার মা আনন্দকে তাঁর সু-উচ্চ মহিমান্বিত স্থান থেকে নামিয়ে এনেছে ধুলোয় অবমানিতের অবস্থানে। এই অবমাননা প্রকৃতির বুকে বাজে গভীর হয়ে। তখনই সে মন্ত্রের উপাদানগুলো নষ্ট করে দিলে আনন্দ হয়ে ওঠেন তাঁর পূর্ব অবস্থানে স্থিত ও আত্মস্থ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে প্রকৃতির মায়ের। আনন্দ স্ব-মহিমায় উচ্চারণ করেন বুদ্ধশ্লোক।

'চণ্ডালিকা' নাট্যের উপজীব্য হলো সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার অযৌক্তিকতা। বর্ণ প্রথার শিকার সমাজের নিম্নস্তরের এক নারীর মনে মানবিকতার উন্নত আদর্শের প্রভাবে প্রেমভাবের জাগরণ এবং পরিণামে মহত্তর চেতনায় স্থিত হয়ে প্রেম ও কামভাবের পরিত্যাগ এ নাটকের মূল বক্তব্য; যদিও এ পরিণতি আপাতদৃষ্টিতে সমাজসত্তার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সংঘাতের সৃষ্টি করে নি। চণ্ডালকন্যা 'প্রকৃতি'র নিজস্ব গণ্ডীতেই এর উন্মেষ ও সমাপ্তি। তাই মনে হতে পারে, বর্ণপ্রথার অযৌক্তিক সংস্কার থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের উৎক্রমণ চেষ্টা নাটকের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হয়ত ছিল না এবং উন্নত মানবিকতার এ চেতনা এসেছে বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য-দর্শন থেকে। এ মনোভাব থেকেই সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক মানবতাবাদের প্রেক্ষাপটে 'প্রকৃতি'র মুখে কল্পিত সংলাপ বসিয়ে তা দেখাতে চেয়েছেন :

> আমার পূর্বজন্ম বলে কিছু ছিলো, সে জন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম এ সব তোমাদের বানানো কথা, আমি তাতে ভুলবার পাত্রী নই। আমি বেশ বুঝতে পারছি ঐ আষাঢ়ে কৈফিয়ৎ তৈরী ক'রে তোমরা তোমাদের ইহজন্মের ঘোরতর অন্যায় অবিচারকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছো। আমি তার কিছুই মানিনা। যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যা ।[৩৭]

বস্তুত, এ দৃষ্টিভঙ্গি নাট্যকাহিনী ও চরিত্রের সংলাপে না থাকলেও এটিই যে নাট্যকারের মনে অনুপ্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল তা স্পষ্ট। যেমন, মূল কাহিনীতে চণ্ডালিকা ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণ করে সব রকম রিপু ও প্রবৃত্তি দমনের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে এ নাটকে তা অভিষিক্ত হয়েছে একান্ত মানবিক চেতনায়। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাব শেষ পর্যন্ত ধর্মবোধ অতিক্রম করে মানবিকতাবোধে সমর্পিত হয়েছে। এ বিবেচনায় সমাজ সংগঠনের সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র সরাসরি সংঘাত না হলেও এ চেতনার মূল্য কম নয়।

বিশেষত, ভারতের বর্ণপ্রথা ছিল শ্রেণী শোষণের এক মারাত্মক হাতিয়ার। উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা নিম্ন শ্রেণীকে এই গণ্ডীতে বেঁধে বিভিন্নমুখী শোষণের পথ করে রেখেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে সব শ্রেণীর মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার এ নাটক দীর্ঘ শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক প্রতিবাদ। স্মর্তব্য, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা গান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে শরীক করতে চেয়েছিলেন ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষকে। এ উদ্দেশ্যে তিনি হরিজন-কল্যাণমূলক সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে অস্পৃশ্যতা বিরোধী 'চণ্ডালিকা' নাটক চলমান রাজনৈতিক ভাবধারার পরিপূরক ছিল বলে ধারণা করা যায়।

'চণ্ডালিকা' নাটকের অপর বিবেচ্য বিষয় হলো, রিপুর কঠিন সংযমের দ্বারা চরিত্রের

---

৩৭. আবু সয়ীদ আইয়ুব , পান্থজনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত মহিমা প্রকাশের তত্ত্ব। দেখা যাচ্ছে , রিপু দমনে ব্যর্থ আনন্দের মধ্যে দৈহিক কান্তি এবং চারিত্রিক মহিমার অভাব ঘটেছে যা আহত করেছে রিপু-তাড়িত চণ্ডালিনী কন্যাকেও। শারীরবৃত্তিক নিয়মে রিপুর আবির্ভাব এবং তার যৌক্তিক প্রশমন ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক দিক থেকে হানিকর হওয়ার কথা নয়। বরং এর অবদমনই জন্ম দিতে পারে বিভিন্ন বিকৃতির । বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের জন্য এই দমন শীল (আচরণ) পালনের বিষয় হলেও প্রকৃতির ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া কঠিন। তাই আনন্দকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার সক্রিয়তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বিশেষত, এই সক্রিয়তার সঙ্গে যখন তার মায়ের মৃত্যুও জড়িত।

একই বছর রচিত 'বাঁশরী' (১৯৩৩) নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নিষ্কাম প্রেমতত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষ্যযোগ্য। এখানে বাঁশরী-ক্ষিতীশ ও সুষমা-সোমশংকর নামে চারজন যুবক-যুবতী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে যারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়। বাঁশরী সরকার বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মেয়ে। সে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমত্তায় চৌকস। সুষমা তার বান্ধবী। শম্ভূগড় রাজ্যের রাজকুমার সোমশঙ্করের সঙ্গে বাঁশরীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । সবার ধারণা, তাদের মধ্যে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। সুষমার শিক্ষক পুরন্দর এক অদ্ভুত রহস্যময় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সে ইউরোপেও কিছুদিন কাটিয়েছে। সুষমা তাকে ভক্তি করে এবং ভালোবাসে। কিন্তু পুরন্দরের রয়েছে এক অদ্ভুত দীক্ষামন্ত্র – নির্বিশেষে প্রেম, নির্বিকার আনন্দ এবং নিরাসক্ত আত্মনিবেদন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে সুষমাকে নির্দেশ দেয় সোমশঙ্করকে বিয়ে করার। অপর দিকে সোমশঙ্করের পিতার ওপর প্রভাব খাটিয়ে সে সুষমাকে তাঁর পুত্রবধূ করার ব্যবস্থা করে। ফলে সুষমা যাকে ভালোবাসে তাকে পেল না , আবার সোমশঙ্করের আকাঙ্ক্ষাও সার্থক হলো না । এভাবে পরস্পর অনাসক্ত দুই নর-নারী আবদ্ধ হলো পরিণয় সূত্রে। সোমশঙ্করকে না পাওয়ায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো বাঁশরীর জীবন। সে ক্ষিতীশ নামে এক বাস্তববাদী সাহিত্যিককে সঙ্গী হিসেবে গহণ করে। কিন্তু স্পষ্টতই তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করতে ছাড়ে না । আবার যখন সে জানতে পারল যে, সোমশঙ্কর সুষমাকে বিয়ে করলেও ভালোবাসে কেবল বাঁশরীকে, তখনই সে ক্ষিতীশকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে এবং সোমশঙ্করের সেই নিরাসক্ত নির্বিকার ভালোবাসাই সে তার বঞ্চিত জীবনের সান্ত্বনা

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বেছে নেয়।

এ নাটকের সঙ্গে চার বছর আগে রচিত উপন্যাস ' শেষের কবিতা'র সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সে দিক থেকে প্রেম ও বিয়ে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ মনোভঙ্গির বাহন হিসেবে নাটকটি বিবেচ্য। এবং তা হলো, সংসারসীমায় প্রেম হয় সঙ্কুচিত এবং প্রেমের মুক্তি ঘটে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে নিষ্কাম ভালোবাসায়। অবশ্য 'শেষের কবিতা'য় অমিত লাবণ্যর মধ্যে এ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে চাইলেও তাদের মধ্যেকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরগত বাধা যে ছিল প্রায় অনতিক্রম্য সেই বাস্তবতা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু 'বাঁশরী' তে সেই প্রতিবন্ধক ছিল না; ছিল এক অবাস্তব চরিত্র পুরন্দরের অবাস্তব তত্ত্বের প্রভাব। পুরন্দরের নির্বিশেষ প্রেম কিংবা নিষ্কাম আত্মনিবেদনভাব অনেকটা জৈবিক নিয়ম বিরোধী বলে এ নাটকের বক্তব্য অর্থহীনতায় পর্যবসিত। [৩৮] তা ছাড়া চরিত্র চিত্রণের দিক থেকে একমাত্র বাঁশরী ভিন্ন অন্যরা রক্ত মাংসের সত্তা হয়ে উঠতে পারে নি।[৩৯] এ ধরনের কাল্পনিক ভাবের বাহন 'বাঁশরী' নাটকে তাই রাজনীতি বা সাধারণ মানুষের আশা-আকঙ্ক্ষার প্রতিফলনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। বস্তুত, পুরন্দর, বাঁশরী, সোমশংকর, সুষমা প্রত্যেকেই সমাজের উঁচু স্তরের বাসিন্দা। তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ না থাকাটাই স্বাভাবিক। এ দিকে বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলে কথিত ক্ষিতীশকে এ নাটকে যেভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে শেষ পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তাতে নাট্যকারের মনে তৎকালীন বাস্তববাদী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় মেলে। [৪০] রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে বাস্তববাদী সাহিত্যিক ক্ষীতিশকে যেমন বিদ্রূপ করিয়েছেন, তেমনি অন্য একটি প্রবন্ধে প্রগতিমুখী সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে বলেছেন, 'হিসটিরিয়া', 'নকল নৈপুণ্যের নাট্য' , 'চিত্তহীনতা' ইত্যাদি। [৪১]

৩৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৫।

৩৯. (অজিত কুমার ঘোষ , পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০।

কাজী আবদুল ওদুদ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৫৭১)।

৪০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯।

৪১. কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ.৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব বিবেচনায় বলা চলে, 'বাঁশরী' নাটকের বিষয় বক্তব্য ও চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের ভাববাদ-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা পরোক্ষভাবে হলেও শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণীর রাজনীতিকে পুষ্ট করে।

পরবর্তী নাটক 'মালঞ্চ' (১৯৩৩) একই নামের একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ। এটি কবির মৃত্যুর প্রায় ৩৪ বছর পর প্রথমে 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৭৫) , এবং পরে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [৪২]

'মালঞ্চ' নাটকে বলা হয়েছে : আদিত্যের এক দূর সম্পর্কের বোন সরলা মা-বাবাকে হারিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের (আদিত্যের মেসো) বাড়িতে এসে ওঠে। জ্যাঠামশাইয়ের প্রিয় বাগানের পরিচর্যা করে সরলার সময় অতিবাহিত হয়। এক সময় তার সঙ্গে এসে যোগ দেয় আদিত্য। উভয়ে মিলে নিয়োজিত হয় বাগানের উন্নতিতে। আর নিজেদের অজান্তেই তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে। অবশ্য কেউ-ই কোনভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না। এক সময়ে আদিত্যর বিয়ে হয় নীরজার সঙ্গে। কিন্তু কাউকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হয় না সরলা। ও দিকে দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে আদিত্য নীরজার কোন সন্তান হয় নি।

ইতঃমধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নীরজা হয়েছে শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় তার মনে সরলা সম্পর্কে ঈর্ষার উদয় হয়। নীরজার ঈর্ষা সরলা ও আদিত্যের সুপ্ত ভালোবাসাকে প্রকাশ্যে আসার সুযোগ ঘটিয়ে দেয়। এ যেন এতদিন নানা কর্তব্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। স্মৃতি রোমন্থনেই তারা বুঝতে পারে, তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালোবাসে । আর এই অবস্থায় প্রেমের প্রকাশে সরলা মানসদ্বন্দ্বে ভুগলেও আদিত্য তাতে নিঃসঙ্কোচ। নীরজা সমস্ত কিছুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে সরলাকে। সরলার বন্ধু, এক সময়ের প্রেমপ্রার্থী, রমেন সরলাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নীরজাকে অনুরোধ করে। নীরজা বারবার চেষ্টা করেও হয় ব্যর্থ। এ দিকে নীরজার অসুখের মাত্রা বেড়ে গেলে ডাক্তার শেষ সময়ের কথা জানিয়ে দেয়। অন্তিম সময়ে সরলাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিলে সরলা নীরজাকে প্রণাম করতে আসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নীরজা পা সরিয়ে নেয় এবং প্রায় আশ্চর্য উপায়ে দাঁড়িয়ে সরলাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলে, 'পালা,

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালঞ্চ (সূচনাংশ) বিশ্বভারতী, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

পালা এখনি , নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।[৪৩] এ টুকু বলে মেঝের উপর পড়ে নীরজার মৃত্যু ঘটে।

নাট্য কাহিনীতে উপন্যাসের প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষণীয়। নাটকীয় ঘটনাসমূহ প্রধানত সংলাপাশ্রয়ী হওয়ায় তা অনেক ক্ষেত্রে আর্কষণহীন। নীরজার ঈর্ষার প্রভাবে আদিত্য ও সরলার মানসিক পরিবর্তনজাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেপথ্যেই সংগঠিত হয়ে যায়। আদিত্য-সরলার সম্পর্ক উদঘাটিত হওয়ার পর এবং ডাক্তার নীরজার ব্যাপারে শেষ কথা জানিয়ে দিলে সরলার কিছুদিন নেপথ্যে থাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ সময়েই গভর্নরের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সরলার কারাবাস এবং নীরজার ঠিক অন্তিম সময়ে মেয়াদ ফুরোবার আগেই অনির্দেশ্য কারণে তার মুক্তি পাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকে। শেষ মুহূর্তে নীরজার অদ্ভুত আচরণও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া কষ্টকর।

চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে সরলা ও নীরজার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, আদিত্য ও রমেনের মধ্যে তা অনুপস্থিত। রমেন যেন আদিত্য ও সরলার মানসিক পরিবর্তনকে বাঙ্ময় করার জন্যই পরিকল্পিত হয়েছে। আর নীরজার প্রতি দায়িত্ব পালনে কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরলার প্রতি অবদমিত প্রেমের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশের ক্ষেত্রে আদিত্যকে যান্ত্রিক বলে প্রতীয়মান হয়।

এ নাটকেও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির প্রতিফলন নেই বললে চলে। কিন্তু রমেন ও সরলার অপরাধের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনার দাবি রাখে। উপন্যাস কিংবা নাটকটি রচনার সময় এ দেশে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদের ধারা বেশ সক্রিয় ছিল।[৪৪] তারই প্রেক্ষাপটে রমেন ও সরলাকে জেলে প্রবেশ করানো হয়েছে। রমেন যেন অনেকটা নিশ্চিত হয়েই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করতে গেছে। যাওয়ার পূর্বে রমেন সরলার সংলাপ থেকে জানা যায় যে, আদিত্যের কাছ থেকে সরলা তার ভালোবাসার স্বীকৃতি পেলেই রমেন সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সরলা নিরাশ্রয় হয়ে পড়লে সে দেশ উদ্ধারের চেয়ে সরলা উদ্ধারেই যে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী তা স্পষ্টভাবেই বোঝানো হয়েছে। রমেনের সংলাপে আছে তার প্রমাণ :

---

৪৩. ঐ ,পৃ.১০১।

৪৪. মুক্তির সংগ্রামে ভারত,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৭৬ পৃ. ১২০-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

'তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায় , এ কি কখনো হতে পারে ? ...

সরলা

কি করবে তুমি ?

রমেন

তোমার অশুভ গ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন কি কালাপানির পার পর্যন্ত।[৪৫]

- যেন ব্যাপারটা এ রকম যে, রমেনের মতো সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কোন মহৎ কর্তব্য ছিলো না বলেই তারা ঐ পথে গিয়েছিল। এবং ঐ পথে দেশপ্রেমের চেয়ে চমকই যেন বেশি। শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে তিনি আন্দোলনকারীদের 'দুর্জন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সময় রমেনের সঙ্গে সরলাও নিশান হাতে যাওয়ার প্রস্তাব করে বলে :

সরলা

আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।

রমেন

হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না। [৪৬]

বলা বাহুল্য, সন্ত্রাসবাদের প্রতি কবির বরাবরের মতো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই এই মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। স্মর্তব্য, এর পরের বছরই কবি তাঁর সর্বশেষ রাজনৈতিক উপন্যাস 'চার অধ্যায়' রচনা করেন যেখানে সন্ত্রাসবাদকে স্পষ্টভাবেই বিরোধিতা করা হয়েছে। [৪৭]

৪৫.মালঞ্চ, ঐ, পৃ.৪৯।

৪৬. ঐ ,পৃ.৮০।

৪৭. এ বিষয়ে অরবিন্দ পোদ্দার 'রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', নাজমা জেসমিন চৌধুরী 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' এবং আবু জাফর 'সাহিত্যে সমাজ ভাবনা' গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এর পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্রিটিশের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিরও পরোক্ষ সমালোচনা আছে ঐ নাটকেই। যেমন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরলা জেলে যাওয়ার উপায় খোঁজ করলে রমেন বলে :

> জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে, কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না ।[৪৮]

কবি ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করলেও তাদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। এ সময় বাংলার গভর্নর 'উৎপীড়ন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে পরিচিত জন এন্ডারসন সন্ত্রাসবাদ দমনে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। [৪৯] অত্যন্ত পরোক্ষভাবে হলেও তার প্রতিফলন 'মালঞ্চ' নাটকে লক্ষ্য করা যায়। এতে আবারও প্রমাণিত হয় যে, লেখকের অজান্তেই দেশের তৎকালীন রাজনীতি প্রভাব ফেলেছে তাঁর রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ গদ্যনাটক 'মুক্তির উপায়' (১৯৩৮) মাসিক 'অলকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বেরোয় কবির মৃত্যুর সাত বছর পর (১৯৪৮) । নাটিকাটি তাঁর একই নামের একটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ।

লোভী সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দের জনৈক ভক্ত ফকির ও একই গ্রামের উড়নচণ্ডী স্বভাবের যুবক মাখনলালের কৌতুকজনক সংসার-যাপনের কাহিনী এ নাট্যের বর্ণিত বিষয়। ফকির গুরুভক্তিতে সংসার সম্পর্কে ভীষণ উদাসীন। এক পর্যায়ে স্ত্রীর স্বর্ণালংকারও সে গুরুকে দান করে আসে। তার স্ত্রী হৈমবতীর এক এম.এ. পাশ বোন পুষ্পমালা এ সব শুনে ভণ্ড অচ্যুতানন্দের মুখোশ খুলে দেয়। গুরু পুলিশের ভয়ে যায় পালিয়ে। গুরুকে হারিয়ে সংসার বিরাগী ফকির আস্তানা গাড়ে পাশের পাড়ায়। এ দিকে ঐ পাড়ার মাখনলাল তার দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর গ্রামছাড়া। তার দাদা ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে মাখনলাল ভেবে ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ফকির। অবশেষে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে হৈমবতী। আবার মাখনলালের চেহারার

---

৪৮. মালঞ্চ, ঐ, পৃ.৪৭।

৪৯. সুমিত সরকার পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ জেনে পুষ্পমালা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় হনুমানের চরিত্রে সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অভিনেতা চাই বলে। সেই বিজ্ঞাপন দেখে মাখনলাল চলে আসলে হয়ে যায় সব সমস্যার সমাধান।

নাটকে পুষ্পমালার সঙ্গে ফকিরের কথোপকথনে ভণ্ড গুরু ও শিষ্যের সাধন প্রক্রিয়ার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বেশ কৌতুককর। কিন্তু মাখনলালকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুষ্পমালার কৌশলটি অবিশ্বাস্য ও অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত। ফলে সমাপ্তিটি মিলনান্তক হলেও তা অনেকখানি নিষ্প্রভ।

রাজনীতির দিক থেকে এ নাটক অনেকাংশে প্রগতিমুখী। কারণ, ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের সারল্যকে পুঁজি করে অনেক প্রবঞ্চক নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর। গুরু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির ইত্যাদি ছদ্মবেশে এরা সক্রিয়। তাদের প্রতারণা ও ভণ্ডামী এ কৌতুক নাটিকার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করে নাট্যকার তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সব ভণ্ড তপস্বীর মুখোশ উন্মোচন যে পরোক্ষভাবে প্রগতিশীল রাজনীতির সহায়ক তা অস্বীকার করা চলে না।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি

শারদোৎসব : 'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের ঋতু উৎসব উদযাপন উপলক্ষে রচিত। এ সময় রাজনীতিতে স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন বেশ সক্রিয় ভাবে। দেশপ্রেমমূলক বহু গান রচনা করে এবং গেয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত 'বঙ্গভঙ্গ' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।[১] স্বাদেশিকতাবোধে উজ্জীবিত এ গানগুলো বর্তমানে বাংলার প্রাণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গচ্ছেদ সংক্রান্ত এ আন্দোলন ক্রমশ হিংসাত্মক প্রক্রিয়ার দিকে যেতে থাকলে তিনি সরে এসেছিলেন সেখান থেকে। এ সময় খেয়া (১৯০৬) কাব্যের 'বিদায়' কবিতায় তিনি লিখলেন :

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।[২]

'শারদোৎসব' রচনার কয়েক মাস আগে স্বদেশী আন্দোলন উত্তুঙ্গে উঠেছিল। এ পর্যায়ে ৩০-এ এপ্রিল (১৯০৮) ঘটে একটি অভাবনীয় ঘটনা। বিহারের মজঃফরপুরে একজন ইংরেজ মহিলা তাঁর কন্যাসহ স্বদেশীদের বোমা হামলায় নিহত হন। এ সূত্রে প্রকাশ পেয়ে যায় বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের সক্রিয়তা। বিপ্লবীরা তৎকালীন কলকাতা প্রেসিডেন্সীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বোমা নিক্ষেপ করলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ক্ষুদিরাম বসু নামে একজন বিপ্লবী ধরা পড়েন এবং অপর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার ভয়ে আত্মঘাতী হন। কয়েকদিন পর কলকাতার মানিকনগরে একটি বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হয় এবং গ্রেপ্তার হন আরও কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। এ ঘটনায় দেশবাসী একদিকে বিস্মিত হয়, অপরদিকে দুঃসাহসী তরুণদের গর্বে উজ্জীবিতও বোধ করে। কিন্তু প্রকাশ্যে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নি। বালগঙ্গাধর তিলক এ সম্পর্কে মন্তব্য করায় তাঁকে ছয় বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড) ,বিশ্বভারতী, ১৩৯৫, পৃ.১৬৯।

২. খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

'পথ ও পাথেয়' (১৯০৮) নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন চৈতন্য লাইব্রেরিতে। তার এক জায়গায় তিনি বলেন :

> বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালি জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায়, ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।[৩]

কিন্তু সে সঙ্গে তিনি এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'উৎপাত', 'দুর্মতি', 'অন্যায় অত্যাচার' বলেও পরোক্ষভাবে ভর্ৎসনা করেন।[৪] এ রকম আত্মঘাতী কর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান পুনরায় সব ধর্ম ও জাতি নিয়ে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ।[৫] এর কিছুদিন পরই ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর (১১আগস্ট) হয় এবং অপর কয়েক জনের দ্বীপান্তর ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়।

দেশ ও সমাজের এ পরিস্থিতিতে কবি রচনা করেন 'শারদোৎসব' নাটক। এর কাহিনীতে আছে : বালকের দল শরতের ছুটিতে গান গাইতে গাইতে পথে বেরিয়েছে। তাদের কলরবে ব্যবসায়ী লক্ষেশ্বরের হিসেবে গোল বেঁধে গেলে সে তাড়া করে বালকদের। রসিক ঠাকুরদা বাৎসল্যের আনন্দে যোগ দেন ঐ বালকদের সঙ্গে । অপর এক বালক উপনন্দ এসে লক্ষেশ্বরকে জানায়, তার গুরু বীণাচার্য সুরসেনের মৃত্যু হয়েছে। সুরসেন ছিলেন লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী। উপনন্দ বলে, সে ঋণ সে পুথি নকল

---

৩. 'রাজা প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী , পূর্বোক্ত , পৃ. ৪৪৭।

৪. ১৯০৮ সালে রচিত 'দেশহিত ' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার , তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে। রবীন্দ্র রচনাবলী (পরিশিষ্ট), পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪০।

৫. রাজা প্রজা , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে শোধ করে দেবে। সে উদ্দেশ্যে কাজে লেগে যায় সে।

বালকদের আনন্দের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন সন্ন্যাসীবেশে রাজা বিজয়াদিত্য। তিনি রাজগৌরব ত্যাগ করে এই বেশ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য। সন্ন্যাসী দেখেন, উপনন্দ গাছের নিচে বসে পুথি নকল করছে। এ ভাবে উপনন্দের ঋণ শোধের বিষয় জানতে পেরে ভারি খুশি হন তিনি। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে উপনন্দও ঋণমুক্তির ছুটি পাচ্ছে।

সে রাজ্যের সামন্ত রাজা সোমপাল সম্রাটের বিরোধিতা করে অখণ্ড রাজ্যের রাজা হতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে সে সন্ন্যাসীর সাহায্য চায়। বণিকও ধনপ্রাপ্তির আশায় সন্ন্যাসীর কৃপাপ্রার্থী। সন্ন্যাসী পরম কৌতুকে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় উভয়কে আশ্বস্ত করেন। এ সময় বিজয়াদিত্যের মন্ত্রী সৈন্যসহ সম্রাটের খোঁজে সেখানে পৌঁছুলে প্রকাশ হয়ে যায় বিজয়াদিত্যের পরিচয়। এ ঘটনায় অভিভূত সোমপাল আত্মসমর্পণ করে এবং সম্রাটও তাকে ক্ষমা করে দেন। এর পর বালক উপনন্দের পক্ষে লক্ষেশ্বরের ঋণ শোধ করে উপনন্দকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নিঃসন্তান সম্রাট। ঠাকুরদাকেও রাজ সভার বয়স্য হিসেবে সঙ্গে নিয়ে উপনন্দসহ সম্রাট আপন রাজ্যে ফিরে যান।

এ নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে ফলে-ফুলে, আলো-বাতাসে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। সেই আনন্দযজ্ঞে ভাগ নিতে হবে মানুষকে । প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘটাতে হবে প্রাণের যোগ। তা হলেই বিশ্বে ভগবানের যে মহানন্দের প্রকাশ ঘটে চলেছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করা যাবে। নাটকে এক স্থানে বলা হয়েছে :

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে , তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না !

... ...

প্রথম বালক

কই ঠাকুর দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী

Dhaka University Institutional Repository

ঐ যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক

হ্যাঁ হ্যাঁ ভেসে আসছে।

সন্ন্যাসী

ঐ যে আকাশ ভরে গেল ।

প্রথম বালক

কিসে।

সন্ন্যাসী

এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে আনন্দে। বাতাসে শিশিরের স্পর্শ পাচ্ছ না ?

দ্বিতীয় বালক

হ্যাঁ পাচ্ছি ।

সন্ন্যাসী

তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা ! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে ! [৬]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এ মিলনাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি নাট্যকার ঋণ শোধের সৌন্দর্য বিষয়ক একটি তত্ত্বও প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে :

'প্রকৃতি আপনার ভিতরে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাইরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয় ; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য। [৭]

সন্ন্যাসীর একটি সংলাপে এর পরিচয় আছে :

'আমি অনেকদিন ভেবেছি , জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন ? কিছুই ভেবে

৬. শারদোৎসব , রবীন্দ্র রচনাবলী , ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী ,১৩৯৩ , পৃ.৪১৬ ।

৭. গ্রন্থ পরিচয় , রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত , পৃ . ৫৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে। বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি ত্যাগ করে করছে। সেই জন্যই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ । কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই , সেইজন্যই এত সৌন্দর্য। [৮]

ঋণ শোধের এই সৌন্দর্যানুভূতি প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জগতেও প্রসারিত। উপনন্দের ঋণ শোধের মধ্যে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের কাহিনী এবং বক্তব্য বিচারে এখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই যদিও নাট্যকারের একটি ভাবনা ছিল এ রকম যে, রাজা বিজয়াদিত্য রাজসম্মান ও গৌরব তুচ্ছ করে বের হয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্য। কিন্তু এ কাহিনীতে একমাত্র ঠাকুরদা ছাড়া কোন সাধারণ মানুষের প্রবেশ ঘটে নি। ফলে সন্ন্যাসীবেশ নিয়েও রাজা বিজয়াদিত্য পেলেন না সাধারণ মানুষ হওয়ার সুযোগ। বস্তুত, মূল রাষ্ট্র-কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক-সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকলে সাধারণত কোন রাজার পক্ষে সাধারণ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। তবে কোন ব্যক্তি, হোন তিনি একজন রাজা , ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে শ্রেণীচ্যুত হতে পারেন । রাজা এখানে সে পথে পা বাড়ান নি। নাটকেই আছে তার প্রমাণ। বিজয়াদিত্যের আসল পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু (চরিত্রগুলোর আন্তঃসম্পর্ক) পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে যায়। সামন্তরাজা সোমপালের সঙ্গে বিজয়াদিত্যের কথোপকথনে তা স্পষ্ট :

সন্ন্যাসী

... এখন তোমার একটা কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব – তাকে দিয়ে তোমার কোন কাজটা করাতে চাও বলো।

রাজা

(নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

---

৮. শারদোৎসব, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্যের ত্রুটি। সে রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্ত স্ব-হস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব। [৯]

প্রকৃতপক্ষে সম্রাট বিজয়াদিত্য যেন প্রাচীন রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী শরৎকালে রাজ্য জয়ের অভিযানেই বেরিয়েছিলেন। যেমন, সোমপাল বলছে, "মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল।" [১০] আর সামন্ত রাজা সোমপালকে দমন করে সেই বিজয়যাত্রা হলো সার্থক। শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কিংবা ঋণ শোধের সৌন্দর্য সবই শেষ পর্যায়ে হয়ে পড়ে গৌণ। আবার উপনন্দের নিজস্ব শ্রমে তার গুরুর ঋণ শোধের মধ্যে যে মানবীয় মহত্ত্ব প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল সেই মহিমাও সম্রাট বিজয়াদিত্যের রাজোচিত ঔদার্যে সার্থক হতে পারে নি। লক্ষেশ্বরকে হাজার কার্ষাপণ দিয়ে উপনন্দকে সম্রাট যেভাবে নিজপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন তাতে উপনন্দের প্রতি করুণাই প্রকাশিত হয়। উপনন্দও এ প্রস্তাব তার পরম সৌভাগ্য হিসেবে নেয় এবং বিজয়াদিত্যের পা জড়িয়ে ধরে জানায় অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। [১১]

এ ভাবে মানুষের শ্রমের প্রতি আস্থা এবং যে আত্মসম্মান অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বারবার বলে আসছিলেন , উপনন্দের মধ্যে সেই আত্মসম্মানও বিনষ্ট হয়। মানুষ যে নিজেই নিজের মুক্তিদাতা ও ভাগ্যনিয়ন্তা, এ ধারণা নাটকের পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে অনির্দিষ্ট ভাগ্য কিংবা কোন মুক্তিদাতা মহাশক্তির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকার বিষয়টি। তাই উপনন্দ আপন শ্রম ও কর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে নি। তার সক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত হয়েছে ; সে নিজে হয়েছে পরানুগ্রহের মুখাপেক্ষী। আবার উপনন্দের ত্রাণকর্তা হিসেবে রাজা বিজয়াদিত্য চরিত্রে যে মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে তা তৎকালীন

৯. ঐ , পৃ . ৪১৯।

১০. ঐ , পৃ . ৪১৯।

১১. ঐ , পৃ . ৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসকের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।[১২] অথচ নাটক রচনার সময় ক্ষুদিরামসহ তিনজন বিপ্লবীকে ব্রিটিশ রাজ হত্যা করেছিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে।[১৩] নাম না জানা চারণ কবি 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানে বাঙালি হৃদয়ের সেই মর্মবেদনা প্রকাশের পাশাপাশি বিপ্লবীদেরও অমর করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের এক পর্যায়ে এই দুঃসাহসিক কাজের ক্ষীণ প্রশংসা করলেও এ নাটকে উপেক্ষা করেছেন সে সময়ের বাঙালির প্রাণের কথা। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শারদোৎসব' নাটকে মানুষের রাজনৈতিক মুক্তির বাণীও অনুপস্থিত। শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য প্রকাশক কয়েকটি অসাধারণ গান এবং সন্ন্যাসী-বেশধারী রাজা লক্ষেশ্বর ও সোমপালের কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যগুলোই নাটকের প্রধান আকর্ষণ।

উক্ত বিষয়গুলো ছাড়া 'শারদোৎসব' নাটকে রাজা ও রাষ্ট্রবিষয়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন , রাজা প্রতাপ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে থাকবে সন্ন্যাসীসুলভ মহিমা ও উদারতা। যে কোন প্রজার সঙ্গে তাঁর থাকবে সহজ সম্পর্ক। দ্বিধা-সংকোচ কিংবা ভীতি সে সম্পর্কের ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। অবাধ্য প্রজা কিংবা শত্রুকে তিনি জয় করবেন মহত্ত্ব ও উদারতা দিয়ে। অবশ্য

---

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনায় প্রাচীন ভারতের দেবতুল্য একজন যথার্থ রাজার অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। এ কল্পনা কখনও কখনও প্রসারিত হয়েছে ব্রিটিশ রাজার প্রতিও। যেমন, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ডের 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স'-এর ভারত সফর উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> 'ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, এ কথা সত্য । হিন্দু-ভারত বর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন।' 'রাজভক্তি', রাজা প্রজা, পূর্বোক্ত , পৃ. ৪৩৮।

১৩. অপর দুজন কানাইলাল ও সত্যেন। এ দুজন মানিকতলার বোমা কারখানা থেকে গ্রেপ্তার হন। এদের মধ্যে সত্যেন বোমা মামলা চলার সময় রাজসাক্ষী হওয়া নরেন গোঁসাইকে (তাদেরই প্রাক্তন সদস্য) জেলের ভেতরেই রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন। সুধাংশু দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

নেপথ্যে বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর শক্তিমত্তার প্রকাশ থাকবে না এমন নয় । পক্ষান্তরে প্রজাবৃন্দ রাজার সঙ্গে সাধারণভাবে মিশলেও রাজাকে তারা দেবতুল্য বলেই মান্য করবে। রাজা যেন তাদের কাছে মঙ্গলের কল্যাণের দেবতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ । রাজার প্রতি তাদের আস্থা ও ভরসা থাকবে অবিচল। এর বিচ্যুতিতে তাদের প্রজা ধর্মেরই বিচ্যুতি। 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন :

> 'রাষ্ট্র ব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে, মঙ্গলের প্রত্যক্ষ স্বরূপকে রাজারূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি ; নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই – রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই, আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না। [১৪]

এ ধরনের রাজা যেন কোন অবস্থাতেই প্রজার অমঙ্গল সাধন করতে পারে না , ক্ষতি করতে পারে না। তাই শোষণ পীড়ন এবং তার প্রতিবাদ বিদ্রোহ কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না সেখানে। সেখানে বিরাজ করবে কেবল চিরকল্যাণ ও শান্তি।

বলা বাহুল্য, রাজাবিষয়ক এ ভাবনা কোন স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধেও কোন রকম বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অপারগ। সে দৃষ্টিকোণে, ব্রিটিশ শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত উপনিবেশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনকারীদের মনে এ ভাবনার নাট্যিক প্রকাশ যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তা নাট্যকার ভেবেছেন বলে প্রতীয়মান হয় না।

প্রায়শ্চিত্ত : 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৮৯০) রচনার সময় কবি অবস্থান করছিলেন শান্তি নিকেতনে। পর পর কয়েক জন আত্মীয় ও বান্ধবের মৃত্যু সংবাদে সে সময় তিনি মানসিক ভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত। শারীরিক অবস্থাও ভাল নয়। জগৎ সংসার , মানবজীবন ও বিশ্বজীবন নিয়ে বেশ বিচলিত তিনি । তাঁর মনের মধ্যে কোন এক আনন্দঘন সত্তার সঙ্গে, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য, পরিচিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। [১৫] প্রতিদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই শান্তিনিকেতনের মন্দিরের পূর্ব তোরণতলে

১৪. রাজভক্তি , পূর্বোক্ত , পৃ. ৪৩৯।

১৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্রজীবনী ,দ্বিতীয় খণ্ড,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানে মগ্ন হন তিনি। উপলব্ধ ভাবনাগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের বলেন এবং ঘরে এসে লিখে রাখেন। এ গুলোই পরে প্রকাশিত হয় 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা' হিসেবে। রাজনীতিতে কংগ্রেসে নরমপন্থা ও চরমপন্থার দ্বন্দ্বে এর আগে নরমপন্থীদের বিজয় হয়েছে। তারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রিটিশের অধীন স্বায়ত্তশাসন পেতে চায়। অপর দিকে চরমপন্থীরা জঙ্গী জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত হয়ে স্ব-রাজ লাভের জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শুরু করে সশস্ত্র আন্দোলন। দ্রুত এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। কলকাতার বিপ্লবীরা বন্দী থাকায় তা ঢাকাকেন্দ্রিক ভাবে পূর্ববঙ্গে, পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে ব্যাপক রূপ লাভ করে।[১৬]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাজনীতির কোনটির সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন না। সম্ভবত সে কারণেই সমকালীন রাজনীতির কোন প্রত্যক্ষ ছাপও পরিলক্ষিত হয় না 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে। কবি রচিত 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এ নাটকের উপজীব্য ।

এর কাহিনীতে বলা হয়েছে : যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য প্রজাপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী। যুবরাজ উদয়াদিত্যকে তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মাধবপুর পরগণার শাসনভার থেকে। মানবিক কারণে কৃষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনা আদায় করেন নি উদয়াদিত্য। প্রতাপাদিত্যের খুড়ো বসন্ত রায় দিল্লীর মুসলমান শাসকের অধীনতা স্বীকার করায় তাঁকেও হত্যা করতে ঘাতক পাঠান প্রতাপাদিত্যই। আবার পুত্রবধূ সুরমার পিতা শ্রীপুরের রাজা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না বলে পুত্রবধূর ওপরও তিনি ক্ষুব্ধ। নিয়োজিত ঘাতক করুণার বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধ রাজা বসন্ত রায়কে হত্যা করলো না। এ সময় প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁর ভাঁড়-সহ আসেন শ্বশুরবাড়ি। রামচন্দ্রের ভাঁড় স্ত্রী বেশে প্রতাপাদিত্যের মহিষীর সঙ্গে রঙ্গ করতে গিয়ে ধরা পড়ে । ক্ষুব্ধ প্রতাপাদিত্য জামাতা রামচন্দ্রেরও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। অবশ্য উদয়াদিত্য, সুরমা ও বিভার সাহায্যে পালাতে সমর্থ হন রামচন্দ্র। এ অপরাধে উদয়াদিত্যের কারাদণ্ড হলে তাকে বসন্ত রায় কৌশলে উদ্ধার করেন। উত্তেজিত প্রতাপাদিত্য পুনরায় উদয়াদিত্যকে বন্দী করেন এবং নির্দেশ দেন বসন্ত রায়ের ছিন্নমুণ্ড

১৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আসার । এবার নির্দেশমত কাজ করে ঘাতক। বন্দী উদয়াদিত্য রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ও দিকে রাজমহিষীর ষড়যন্ত্রে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন সুরমা। রাজকন্যা বিভাও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। অবশেষে উদয়াদিত্য, বিভা এবং মাধবপুরের কৃষক-নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেশত্যাগ করেন কাশীর উদ্দেশে।

কাহিনী এবং কয়েকটি চরিত্র ইতিহাসের পাতা থেকে নেয়া বলে নাট্যকার এ নাটককে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের বিপুল কর্মযজ্ঞ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়– যেগুলো সাধারণত ঐতিহাসিক নাটকের ভিত্তি হিসেবে থাকে – এখানে নেই বললে চলে। [১৭] যশোর-চন্দ্রদ্বীপের কলহ , বসন্ত রায়কে হত্যার চেষ্টা, রাজপুত্র উদয়াদিত্যকে বন্দী করা সবই পারিবারিক ঘটনামাত্র।[১৮] তাই কোন কোন সমালোচক এটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন সামাজিক নাটক হিসেবে। [১৯] তবে এখানে উৎপীড়িত হয়েও বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, বিভা ও সুরমার অহিংস প্রতিবাদে এক বিশ্বদেবতার প্রতি আস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অপার্থিব , ঐশীশক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং দেহাতীত কোন পরমাত্মার কাছে নিঃসংশয় আত্মসমর্পণমূলক গানে সাংকেতিকতার উপাদান স্পষ্ট। তাই এটিকে সাংকেতিক নাটক হিসেবে মেনে নেয়াই যুক্তযুক্ত। [২০]

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকের আবেদন হতাশাব্যঞ্জক। লক্ষ্যযোগ্য যে, এক. প্রতাপাদিত্যের পশুশক্তির বিরুদ্ধে নাটকের প্রোটাগনিস্ট চরিত্ররা কোন সক্রিয় প্রতিরোধে না যাওয়ায় নাট্যদ্বন্দ্ব যেমন পরিস্ফুট হয় নি, তেমনি অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিজয়ে এ নাটক দর্শক পাঠকের মনে হতাশাবোধ সৃষ্টি করে। ব্রিটিশের নির্মম শাসন-শোষণের ও নিষ্ঠুর দমনের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন যখন

---

১৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা,কলকাতা, ১৩৯৯ , পৃ.৩৫৫।

১৮. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

১৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য , পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৫৫।

২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা , ১৯৭১, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবাসীর মনে সাহস ও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলছে এবং তরুণ বিপ্লবীরা একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে হাসিমুখে মৃত্যু, দ্বীপান্তরসহ নানাবিধ শাস্তি গ্রহণ করছে, সেই সময় এ নাটককে উৎসাহব্যঞ্জক বলা কঠিন।

দুই. এ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী কৃষকদের বিদ্রোহে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে । উপন্যাসে এ চরিত্র ছিল না বলে কোন কোন সমালোচক চরিত্রটিকে অভিনব বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, এটি কবির নিজস্ব প্রাণসত্তার রূপক অথচ প্রায় অবাস্তব এক চরিত্র। মাধবপুরের কৃষক নেতা হলেও সে নিজে সংসারত্যাগী বাউল। অবাস্তবতার প্রথম সূত্র এখানেই নিহিত। কৃষক-বিদ্রোহের নেতা বাউল হলে তাদের অভাব অভিযোগ, দাবি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তার একাত্ম হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই পদে পদে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কৃষকদের মতান্তর ঘটেছে। অজন্মার ফলে ফসল না হওয়ায় কৃষকরা অস্বীকার করে খাজনা দিতে। কৃষকদের এই মৌলিক দাবি ধনঞ্জয় অধ্যাত্মবাদের মোড়কে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। রাজাকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে কি বলতে হবে তা সে শেখায় এ ভাবে :

> ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না। [২১]

বাঁচার অন্ন মানুষের মৌলিক চাহিদা। সেই অন্ন রাজা খাজনা হিসেবে কেড়ে নিতে চায়। কেবল বাধ্য হয়েই মানুষ তা তুলে দেয় রাজার হাতে। অথচ এখানে ধনঞ্জয় কথিত 'মূর্খ' প্রজারা তা-ও রাজাকে দিয়ে ফেলতে চায়। কেবল ধনঞ্জয়ই তাতে বাদ সাধে, তবে অদ্ভুত যুক্তিতে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বৈরাগীর সংলাপে তা লক্ষ্য করা যায় :

> প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে ?
>
> ধনঞ্জয় । হ্যাঁ মহারাজ, আমি-ই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না - পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই – প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে

---

২১. প্রায়শ্চিত্ত, রবীন্দ্র রচনাবলী , ৯ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ হত্যার অপরাধী করিসনে।[২২]

প্রকৃতপক্ষে, ধনঞ্জয়ের কথা বিশ্বাস করলে এদেশে যেসব বিখ্যাত কৃষকবিদ্রোহ ঘটেছিল যেমন, নীল বিদ্রোহ (১৮৬০), আসামের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২), মোপলা বিদ্রোহ(১৮৭৩-৯৬) কিংবা প্রায় সমকালীন বাগেরহাটের কৃষক সংগ্রাম (১৯০৭) ও চম্পারণের নীল বিদ্রোহ (১৯০৮) সে সবই ভুলে যেতে হয়। উক্ত বিদ্রোহগুলোতে এদেশের কৃষকরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তার এতটুকু লেশ এ নাটকে নেই।[২৩] বিপরীতে ধনঞ্জয় প্রজাদেরকে মার খাওয়া এবং তা সহ্য করার গূঢ় মন্ত্র শেখায় :

ধনঞ্জয় । একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে ? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে ?

(প্রজা)১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড় অপমান !

ধনঞ্জয় । আমার চেলা হয়েও তোদের মান সম্ভ্রম আছে ?
এখনো সবাই তোদের গায়ে ধূলো দেয় না রে ?
তবে এখনো তোরা ধরা পড়িসনি ? তবে এখনো আরো

---

২২. ঐ ,ঐ , পৃ .১৩৭।

২৩.বাংলার নীল চাষীদের ব্যাপক বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে গঠন করেছিল 'নীল কমিশন'। এ কমিশনের সামনে কয়েকজন চাষী যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাতে তাদের দুরন্ত সাহস ও নির্ভীক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

দিনু মণ্ডল – আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না–

পাঞ্জু মোল্লাহ – আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল বুনব না।

জামি মোল্লা – বরং বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব, ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনব না। (উদ্ধৃত). প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ.৭২।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক বাকী আছে।

২। বাকী আর রইল কী ঠাকুর! এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ওদিকে পিঠের জ্বালা-ও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে – একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই ?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।[২৪]

এমন কি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে প্রজারা রাজার কাছে যাওয়ার সময় হাতিয়ার নিতে চাইলে সে বলে :

কেন রে হাতিয়ার নিয়ে কী করবি ?

৩। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তাহলে –

ধনঞ্জয়। তাহলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ। তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয় তবে এই খানেই থাক।[২৫]

অর্থাৎ পেয়াদা মারলে প্রজারা কেবল পড়ে পড়ে মার খাবে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করবে না কিংবা প্রতিশোধ নিতেও চাইবে না। মার কেমন করে খেতে হয়, তাই শুধু শিখবে। ধনঞ্জয়রূপী রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব সম্পর্কে এক কমিউনিস্ট নেতা বলেছিলেন :

মারের বিরুদ্ধে দরখাস্তও লিখো না, লড়াইও কর না, তোমার মার খাওয়া যাতে ধন্য হয় তাই করো, অর্থাৎ তোমার অন্তরের রিপুকে প্রশ্রয় দিও না, অন্তরের

২৪. ঐ ,ঐ, পৃ . ১১৬-১১৭।

২৫. ঐ ,ঐ, পৃ.১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

রিপুকে তাড়িয়ে যে মারে তার চেয়ে বড়ো হও, তবেই তোমার মার খাওয়া ধন্য হবে। [২৬]

এ মারের চোটে মারা গেলেও ক্ষতি নেই। ধনঞ্জয় বলছে :

বেটারা কেবল তোরা বাঁচতে চাস্ - পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন মরতে দোষ কী হয়েছে ? যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি ! ওরে সেই গানটা ধর্ ।

গান

বলো ভাই , ধন্য হরি।
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।[২৭]

বস্তুতপক্ষে, এ নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজাবিষয়ক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। দেবতার প্রত্যক্ষস্বরূপ বলে রাজা স্বৈরাচারী হলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা সঙ্গত নয়। এ ভাবনা সক্রিয় ছিল বলেই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের স্বৈরাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রজা কিংবা অন্য কেউ কোন রকম বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারে নি। বরং উৎপীড়িত হয়ে অনেককে রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোভঙ্গি প্রজাদের কোন রকম অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করার উৎসাহ দেয় না। তাদের করে রাখে অনির্দেশ্য রহস্যময় কোন শক্তির মুখাপেক্ষী।

কোন কোন সমালোচক ধনঞ্জয় চরিত্রের 'অহিংস আত্মিক' সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস নেতা গান্ধী অনুসৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। এ সূত্রে একজন রবীন্দ্র জীবনীকার ধনঞ্জয়কে বলতে চেয়েছেন 'মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূত।' [২৮] ধনঞ্জয়ের সংলাপ ও ক্রিয়ার সঙ্গে গান্ধীর দর্শন এবং কর্ম পদ্ধতির বেশ মিল রয়েছে। তবে, তাকে গান্ধীর অগ্রদূত বলা যায় কি না তা বিচারসাপেক্ষ। বস্তুত, দক্ষিণ

২৬.রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেনের ছদ্মনাম), 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা', মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০৬।

২৭. প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।

২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্র জীবন কথা, কলকাতা , ১৪০১,পৃ.৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) আন্দোলন শুরু হয় ১৮৯৩ সালে। এর কয়েক বছর পর ১৮৯৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছয় হাজার ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট গান্ধী বন্ধ করে দিয়েছিলেন হিংসাত্মক হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজরা তাই এ আন্দোলনকে 'সম্মানজনক ও সুবুদ্ধি-প্রণোদিত' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। [২৯] সে ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের মধ্যে এ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোচরীভূত হয় নি এ অনুমান কষ্টকর। তাই ধনঞ্জয়কে গান্ধীর অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করার সুযোগ বোধ হয় থাকে না। আর গান্ধীবাদের স্বরূপ সম্পর্কে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত হলো, এটি শোষক শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষাকবচ এবং জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ার বিশেষ। [৩০] এ দৃষ্টিকোণ থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংলাপ ও আচরণে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিফলন নেই। বরং তার এই অধ্যাত্মবাদ দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধে শোষিত শ্রেণীকে নিরুৎসাহিত করে। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের অজান্তেই তাঁর মানবতাবাদী মূল্যবোধের বিরোধিতা করে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক।

প্রসঙ্গত, ধনঞ্জয় বৈরাগীর রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সংলাপ পর্যালোচনা করা যায়। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের বলছে, 'সব রাজত্বটাই কি রাজার ? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী ?' [৩১] এ সংলাপের ভিত্তিতে উক্ত জীবনীকার বলেছেন যে, এ

---

২৯. সুপ্রকাশ রায় , গান্ধীবাদের স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.১৪,১৫।

৩০. ১৯৩৪ সালে গান্ধী নিজেই জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বলেন , 'আপনারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, শ্রেণী সংগ্রাম এড়াইবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিয়োগ করিব। যদি অন্যায়ভাবে কখনও আপনাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হয় , তবে আমি আপনাদের হইয়া সংগ্রাম করিব'। উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত , পৃ. ৬০-৬১।

এ বিষয়ে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ বলেন , 'অহিংসার প্রতি তাঁর (গান্ধীর) অন্ধবিশ্বাস একটি অন্তঃসারশূন্য বুলিমাত্র , অপরিণত ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাপুরুষতার প্রতীক'। উদ্ধৃত, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, লেনিনবাদীদের চোখে গান্ধীবাদ, কলকাতা ১৯৯১, পৃ. ৩৯।

৩১. প্রায়শ্চিত্ত , পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে 'ডেমোক্রেসির চরম আদর্শ – প্রজার Sovereign right' তত্ত্ব ঘোষণার কথা আছে। কথাটি মেনে নেয়া কঠিন। প্রথমত, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে রাজার অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এটি দাসযুগ কিংবা সামন্তযুগেই সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত গণতন্ত্রে অর্ধেক রাজত্ব তো জনগণের নয়ই , বরং এতে সরকারের নামে ধনিক শ্রেণীকে জনগণের শ্রমশোষণ এবং তাদের দমন করার অধিকার দেয়া হয়। [৩২]

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সংলাপ :

প্রতাপাদিত্য । .... মাধবপুরের প্রায় দু'বছরের খাজনা বাকী – দেবে কি না।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ দেব না ।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না ! এতবড়ো আস্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়।

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?[৩৩]

[নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের।]

নিম্নরেখ সংলাপগুলো প্রাথমিকভাবে একজন সচেতন নির্যাতিতের একান্ত দাবির মতো মনে

৩২. আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটি কমিটিমাত্র'। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ , মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ২৮।

'রাষ্ট্র হল সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে'।

ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, 'পরিবার , ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী ;দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, মস্কো,১৯৭১, পৃ. ৩১৯।

৩৩. প্রায়শ্চিত্ত , পূর্বোক্ত , পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তাই সমালোচকেরা ধনঞ্জয়কে 'নির্ভীক যোদ্ধা' [৩৪], 'অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু দুঃখী দুর্গতদের পরম সুহৃৎ' [৩৫] বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ এখানে স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে কৃষক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের মানবিক অধিকার। যেমন, এখানে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে – জমিদারের কাছে কৃষকের খাজনা দেয়ার নিয়ম। নিম্নরেখ দ্বিতীয় সংলাপ-অংশ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কৃষকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পর বাকি ফসলের ওপর জমিদারের (এখানে রাজা) অধিকার রয়েছে। কেবল ফসল কম হওয়ায় এ দু'বছর তা দেয়া যাচ্ছে না। অবশ্য পেয়াদা পাঠিয়ে ক্ষুধার সেই অন্নটুকুও যে নিয়ে নেওয়া হবে না তার নিশ্চয়তা নাটকে নেই। তাই, বৈরাগী সত্যিকার অর্থে হতে পারে না 'নির্ভীক যোদ্ধা', 'দুঃখীর সুহৃৎ' কিংবা কৃষক সমাজের নেতা। বরং এ নাটকে কৃষক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সে কৃষকের শত্রুপক্ষের মতবাদ ও স্বার্থ মেনে নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে । সে আসলে শোষকের দালাল।

'প্রায়শ্চিত্ত' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক ধারার প্রথম দিকের নাটক বলে এতে কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক কাহিনী অনুসরণও এর উৎস হতে পারে। বিশেষত, ইতিহাসের প্রতাপাদিত্য চরিত্রটির প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়েও এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা। আর ধনঞ্জয় বৈরাগী অনেকাংশে কবির মতবাদ প্রচারের বাহন। এ দিক থেকে রাজা, রাজত্ব এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে তাঁর মতবাদগুলো কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের লালিত বিশ্বাস। [৩৬] ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, এ সময় ব্যক্তি জীবনে দুঃখভারাক্রান্ত কবি আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে মানসিক স্থিতিলাভের চেষ্টা করছিলেন। এ অবস্থায় ঔপনিবেশিক বা আধুনিক রাষ্ট্রের সংগঠন, তার মূল লক্ষ্য এবং এর সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তীক্ষ্ণ মনোসংযোগ তিনি করতে পারেন নি বলে অনুমান করা চলে। ফলে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস এবং ঔপনিষদিক সামাজিক কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কোথাও কোথাও মানবতা-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৭।

৩৫. নীহার রঞ্জন রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ,কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৩২০।

৩৬. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ,কলকাতা, ১৯৯৬,পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময় এ নাটক তিনি পুনরায় 'পরিত্রাণ' নামে রচনা করেছিলেন আরো সংহত ও সংক্ষিপ্তভাবে।

রাজা : 'রাজা' নাটকটি লেখা হয় ১৯১০ সালে। সেবার পূজার ছুটিতে কবি শিলাইদহ গিয়েছিলেন পুত্র ও পুত্রবধূর সংসার দেখতে। সেখানে পুত্র রথীন্দ্রনাথের কৃষিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু টাকা ব্যয় করে গবেষণাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের সংসারে গিয়ে বহু বছর পর কবি পেলেন গৃহের আনন্দ। শরীর, মন আগের চেয়ে সুস্থ ও প্রফুল্ল। মাস তিনেক আগে গীতাঞ্জলির গানগুলো লেখা হয়েছে , চলছে 'গীতিমাল্য' রচনা। পাশাপাশি রচিত হচ্ছে 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। এসবের মধ্যে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা অরূপ ভগবানবিষয়ক ভাব রূপায়িত হয়েছে। 'রাজা' সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারই নবতর প্রকাশ। [৩৭]

সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে পর্যুদস্ত ব্রিটিশ সরকার নিষ্ঠুর দমন অভিযান শুরু করেছে। পাশাপাশি কংগ্রেসের নরম পন্থীদের খুশি করার জন্য পাশ হয় কিছু সংস্কারমূলক আইন । যেমন প্রজাস্বত্ব আইন সংস্কার (এতে জমিদাররা কর আরোপের স্বাধীনতা ফিরে পায় ।), মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) প্রভৃতি। ফলে এক দিকে দেশীয় জমিদাররা খুশি হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানায় ,অন্য দিকে নিজেদের সাফল্যে উল্লসিত হয় কংগ্রেসের নরমপন্থীরা । কিন্তু চরমপন্থীদের আন্দোলন চলতে থাকে। বিলুপ্ত সমিতিগুলোর জায়গায় গড়ে ওঠে নতুন নতুন বিপ্লবী সমিতি।

৩৭.('রাজা নাটকের ভাব উপজীব্য হইতেছে, মানব হৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস।' প্রমথনাথ বিশী , রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট , কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.২০০।

" 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথের মন অরূপ-সাধনায় নিমগ্ন তখন তিনি অরূপ-তত্ত্ববিষয়ক নাটক 'রাজা' (অরূপ রতন) রচনা করেন"। অজিত কুমার ঘোষ,বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃ.৩৩০।

'রাজা অধ্যাত্মরসের নাট্য' । অজিতকুমার চক্রবর্তী ,রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ.৮৭।

" 'রাজা' নাটকে ভগবদনুভূতির এক অভিনব রূপ ও তাহার সমস্যা প্রকটিত হইয়াছে।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত , পৃ.১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বারাণসীর 'অনুশীলন সমিতি',মহারাষ্ট্রের 'অভিনব ভারত সমিতি',কলকাতার 'রাজাবাজার সমিতি' এবং পূর্ব বঙ্গের 'বরিশাল সমিতি' বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে । ইংল্যান্ডেও স্থাপিত হয় এ রকম একটি শাখা । লন্ডনের 'ইন্ডিয়া হাউস, হয়ে ওঠে প্রবাসী ভারতীয়দের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র । এরই একজন সদস্য মদনলাল ধিংরা ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই ভারত সচিবের এ.ডি.সি. কে হত্যা করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার পকেটে লেখা ছিল :'অমানুষিকভাবে ভারতীয় যুবকদের দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ হিসেবে আমি স্বেচ্ছায় ইংরেজদের রক্তপাতের চেষ্টা করিলাম।' [৩৮]

রাজনীতির এ সব ধারার পরিবর্তে 'রাজা'য় প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে কবির ভগবৎ উপলব্ধি। 'গীতাঞ্জলি'তে পরম পুরুষের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের প্রেমের, অভিসারের ও মিলনের যে আকুতি প্রকাশিত তা-ই এখানে নাট্যকাহিনীর রূপ লাভ করেছে। এই ভাব বৈষ্ণবতত্ত্বের নিকটবর্তী। রাজা এখানে স্বয়ং ভগবান, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। অসীম ব্রহ্ম নিজেকে (রাণী সুদর্শনারূপে) সীমায়িত করেছেন জীবাত্মা বা মানবত্মায়। তাই ভগবান ও

" 'Dakghar' and 'Raja' are both exceptional among Rabindranath's plays being the only two which can be described as religious, as distinct from spiritual, dealing as they do with the relation between God and man." Hirenkumar Sanyal , ' The Plays of Rabindranath Tagore', ACentenary Volume: Rabindranath Tagore 1861-1961 , New Delhi, 1992, p.237 ।

'রাজা নাট্যে এক অভিনব পন্থায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জগৎ চালনার ধারা প্রতীকের দ্বারা রূপায়িত করিয়াছেন। ' অশোক সেন ,রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা ,কলকাতা, ১৩৬৪,পৃ. ২১৪।

" 'রাজা' প্রকৃতপক্ষে 'গীতাঞ্জলি'রই নাট্যরূপ মাত্র"। আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ.২৬৪।

৩৮.সুপ্রকাশ রায়,ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.২০২)।

Dhaka University Institutional Repository

মানবের মধ্যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে নিত্য সম্বন্ধটি হচ্ছে প্রেমের। এই প্রেমেরও নানা রূপ। পিতা-মাতা রূপে,সখা-সখী রূপে, দাস-দাসী রূপে কিংবা বধূ- প্রণয়িনী রূপে ভগবানের প্রেমরস আস্বাদন করা যায়।

এই তত্ত্বই রূপায়িত হয়েছে 'রাজা'র কাহিনীতে। রাণী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হয় কেবল অন্ধকার কক্ষে। রাণীর খুব ইচ্ছা হয় রাজাকে দেখবার। রাজা বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে হাজার জনের একজন হয়ে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রাণীর মতো প্রজারাও কখনও রাজাকে দেখে নি। অনেকের বিশ্বাস , রাজা আদৌ নেই। বসন্ত উৎসবে আগত অনেক বিদেশি রাজাও এ বিষয়ে সন্দিহান। এদের মধ্যে কাঞ্চীরাজ একেবারে নিশ্চিত যে, এ দেশে রাজা নেই। সকল রাজাই মনে মনে রাণী সুদর্শনাকে আকাঙ্ক্ষা করে। এক পর্যায়ে কাঞ্চীরাজ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেন রাণীকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আগুন দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি নিজেই আত্মরক্ষা করেন পালিয়ে। রাণী সুদর্শনা রাজবেশী সুদর্শন এক জুয়াড়িকে রাজা ভেবে তার শরণাপন্ন হন এবং ভুল বুঝে লজ্জা ও সংকোচে মুষড়ে পড়েন। এমন সময় রাজা এসে উদ্ধার করেন সংকুচিতা রাণীকে । কিন্তু আগুনের আলোতে রাজার কুশ্রী রূপ দেখে রাণী বিতৃষ্ণ হন এবং এক সময় পিতৃরাজ্যে ফিরে যান। এ অবস্থায় স্বামীত্যাগী সুদর্শনাকে বিয়ে করার জন্য তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে সাত দেশের রাজা। সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ বন্দী হন। রাজারা পরামর্শ করে সুদর্শনাকে স্বয়ম্বরা হওয়ার আহ্বান জানান। সেই স্বয়ম্বর সভায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হন রাজার বন্ধু বলে কথিত ঠাকুরদা। ঠাকুরদা জানান যে, রাজা সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। যুদ্ধে কাঞ্চীরাজ পরাজিত হন এবং অন্যরা রণে ভঙ্গ দেন। এবার রাণী মনে-প্রাণে রাজাকে কামনা করলেও বিজয়ী রাজা ফিরে যান রাণীকে না নিয়ে। এতে রাণী সুদর্শনা মোহ্যমান হয়ে পড়েন বেদনায়। অগত্যা তিনি নিজেই পুনরায় ফিরে যান সেই অন্ধকার কক্ষে। রাজার কুশ্রী, কালো, ভয়ানক রূপের মধ্যেই তিনি তাঁর পরম পুরুষের সাক্ষাৎ পান। তিনি রাজাকে বলেন :

.... তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও,
তুমি অনুপম।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার সেই প্রেমেরই ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই না, সে তোমার। [৩৯]

দেখা যাচ্ছে, রাণী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ বধূ রূপে । অর্থাৎ প্রেমের মধ্য দিয়েই সুদর্শনার ভগবান উপলব্ধির রূপ প্রকাশিত। কিন্তু রাণী প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। অহংজাত বিভ্রান্তি তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল ভগবানের সান্নিধ্য থেকে। অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং এসে আহ্বান করেন সেখানে তাঁকে উপলব্ধি করতে না পারলেই ভুল হয়, বাইরের মায়া চোখ ভোলায়। সুদর্শনা রাজাকে বাইরে খুঁজতে গিয়ে জুয়াড়ির রূপে ভুলেছিলেন। অবশেষে অনেক অপমান ও দুঃখের সাধনায় তিনি পুনরায় ফিরে পেলেন সেই প্রভুকে। কবির কথায় :

> সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, ... এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। [৪০]

আপাতদৃষ্টিতে 'রাজা' নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, পরম পুরুষের সঙ্গে মিলন সাধনের যে তত্ত্ব নাটকের কাহিনী-কাঠামোয় উপস্থাপিত হয়েছে তারই কোন কোন অংশে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শ। যেমন, কাহিনীতে রাজা একটি দেশের কর্ণধার হিসেবে উপস্থাপিত বলে ঐ দেশের প্রজার সুখ-শান্তি দুঃখ লাঘবের ভার তাঁর উপরই বর্তায়। লক্ষণীয়, দেশের প্রজারা এই দাবি প্রকাশও করেছে। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত এখানেও ঠাকুরদা চরিত্রটি তা নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে তার প্রহেলিকাময় আধ্যাত্মিকতায়। 'কুঞ্জবনের

---

৩৯. 'রাজা', রবীন্দ্র রচনাবলী , ১০ম খণ্ড ,পূর্বোক্ত , পৃ. ২৬৫-২৬৬।

৪০. 'রাজা', গ্রন্থ পরিচয় অংশে 'অরূপ রতনে'র ভূমিকা, ঐ , পৃ.৬৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারে' দৃশ্যে দেখা যায়, দেশে ধর্মের রাজা নেই বলে নাগরিকরা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছে :

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাতদিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকাল মৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো দু'ছেলে আছে আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

দ্বিতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই , তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা !

প্রথম । ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর ! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কি রকম দেখো না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ- না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি- আজ পর্যন্ত দু'টো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয় । তবে ?

ঠাকুরদা । তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোন দিন পুরস্কার দেয়। তা যা ভাই ,আনন্দ করে বলে বেড়া গে – রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব – সব সুরই ঠিক এক তালে মিলবে। [৪১]

প্রজারা তাদের সন্তানের অকাল মৃত্যু, অন্নাভাব এবং দারিদ্র্যের জন্য যতই রাজাকে দায়ী করতে চাইছে, ঠাকুরদা ততই এ সব দুঃখ দৈব এবং অনিবার্য বিধান হিসেবে হাসিমুখে মেনে নেয়ার তত্ত্ব প্রচার করছে।

কোন কোন সমালোচক প্রকারান্তরে এ তত্ত্ব মেনে নিতে চেয়েছেন । যেমন

৪১. 'রাজা', পূর্বোক্ত , পৃ. ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদিরাম দাসের মতে ,'কবির উপলব্ধ রাজা স্বার্থিক প্রয়োজন ও প্রার্থনার সম্পর্কের উর্ধ্বে '।[৪২] বস্তুত, এখানে 'রাজা'র প্রতীকে ভগবান উপলব্ধির বিমূর্ত ভাব মূর্ত করে তোলার প্রচেষ্টা হলেও ঐহিক ও সামাজিক মানুষের কাছে বাস্তব রাজা-প্রজা সম্পর্কটিই প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজার বাহ্যিক শাসন কিছু নেই বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

রাজার বাহ্যিক কর্তব্য সম্পর্কে এ রকম অভিযোগ Edward Thompson-ও করেছিলেন :

> The king in 'Raja' refusesto exercise any of the ordinary prerogatives of kingship, to punish treason or resent insult.[৪৩]

মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী : অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য এবং দুঃখ যন্ত্রণার জন্য দায়ী গুটিকয় মানুষের অন্যায় স্বার্থপরতা। [৪৪] আবু সয়ীদ আইয়ুব তাই ঠাকুরদা প্রসঙ্গে বলেছেন, ' আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুরদার গভীর জ্ঞান থাকলেও মার্কসীয় সমাজবাদ বিষয়ে ছিলো না।' [৪৫] সেই সঙ্গে তিনি এটাও যোগ করেন, 'নাট্যকারেরও বোধ হয় 'রাজা' রচনাকালে সমাজ-চেতনা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিপুষ্ট ছিলো না।' [৪৬] বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনই মার্কসবাদ বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি দ্বিতীয়বার (১৮৯০) লন্ডন যাওয়ার কয়েক বছর আগে চার্লস ডারউনের

---

৪২. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা,১৯৯৬, পৃ. ১৯২।

৪৩. Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist, London,1948, 2nd edn, p. 212।

৪৪.'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :'ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে ; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে' । নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, (প্রথম খণ্ড) ,পরিশিষ্ট অংশ , কলকাতা, ১৯৮৩ , পৃ. ৪০৮।

৪৫. আবু সয়ীদ আইয়ুব,পান্থ জনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ.৫৬।

৪৬. ঐ , ঐ , পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

'Descent of Man', কার্ল মার্কস লিখিত 'Das kapital' (১৮৮৭) এবং 'Communist Menifesto'(১৮৮৮) গ্রন্থগুলো ইংল্যান্ড তথা সারা বিশ্বের চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কিন্তু এ সবের কিছুই তখন রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। নেপাল মজুমদার কিছুটা বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছেন :

> উনিশ শতকের শেষভাগে যে সব মহামনীষী ইংল্যান্ডে বসিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাহাদের সাধন-সম্পদে জগতের যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল – তাহার সিংহ দরজা রবীন্দ্রনাথের নিকট উন্মুক্ত হইল না। [৪৭]

কবি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে 'সাধনা' পত্রিকায় 'সোশ্যালিজম'(১৩৯৯) নামে প্রবন্ধ লিখলেও উক্ত জীবনীকারের ধারণা, কবি সে সময় মার্কস-এঙ্গেলসের মূল কোন রচনা পাঠ করেন নি । তাঁর মতে :

> (কবি) মার্কসবাদের জটিল ও গভীর দার্শনিক এবং আর্থনীতিক রাজনীতিক তত্ত্বাদি অধ্যয়ন, অন্ততঃ তাহার গভীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[৪৮]

তেমনি ১৯৩০ সালেও কবি রাশিয়া সফর শেষে আমেরিকায় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : ' I cannot judge their communism as a philosophy of life because I don't know enough about it.' [৪৯]

এ সব কারণে নাটকের গরিব প্রজাদের দুঃখের কারণ তিনি সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেন নি। দেখলে উক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিকল্প কাহিনীর মাধ্যমে হতে পারত। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য' পর্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে স্বার্থ- সংঘাতময় পৃথিবীর সুখ-দুঃখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া কিছুটা অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়। [৫০] তাই

৪৭. নেপাল মজুমদার ,পূর্বোক্ত,পৃ.৬৭।

৪৮. ঐ, পৃ. ৪০৭।

৪৯. The Boston Herald , 14th october 1930, উদ্ধৃত, নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত ,পৃ. ১০৩।

৫০. জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইসারলিং এ সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'Higher more spiritual world'-এর অধিবাসী বলে। ' Man and

Dhaka University Institutional Repository

রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে গিয়ে অনবধানবশত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটি অন্যায়রীতি সমর্থন করে বসেছেন।

'রাজা' নাটকের মূলতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, 'পরম পুরুষের' কাছে আত্মনিবেদনে মানবের মুক্তির যে তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে প্রকাশ করেছেন, তা বৈজ্ঞানিক বা সমাজতাত্ত্বিক কোন দিক থেকেই সত্যের কাছাকাছি নয়। পৃথিবীর বহু ভাববাদী দার্শনিক এবং ধর্মীয় গুরু এ সব প্রচার করলেও আধুনিক বিজ্ঞান তা বাতিল করেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তুজগতে আমরা বসবাস করছি, তা-ই একমাত্র বাস্তব, অতীন্দ্রিয় কোন সত্তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। আর সামাজিক বিজ্ঞান মতে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ঈশ্বর, শয়তান, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি ধারণা।[৫১] শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ সব মতবাদ (আধ্যাত্মিক) প্রকারান্তরে শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। কার্ল মার্কস তাই ধর্মকে তুলনা করেছিলেন আফিমের সঙ্গে। কারণ কিছু সংখ্যক স্বার্থবাদী মানুষ এর নেশায় মাতিয়ে বিপুল জনতাকে শোষণ করে এবং তাদেরকে নম্র ও সহিষ্ণু থেকে সেই অত্যাচার মেনে নেয়ার প্ররোচনা দেয়। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রক্রিয়াটিকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ 'রাজা' নাটকে বিজ্ঞান-বিরোধী সেই আধ্যাত্মিক মতবাদই পরিবেশিত হয়েছে। এ জন্যেই রবীন্দ্র গুপ্ত 'রাজা' নাটক সম্পর্কে বলেছেন, 'গণনাটকের আসরে এর অভিনয়ের দাবি জরুরি নয়। [৫২] তেমনি নাট্যকার ও তাত্ত্বিক উপল দত্ত, জপেন দা'র জবানিতে বলেছেন, 'অরূপ রতনের (রাজা) মতন নাটক প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লবের অন্তরায়।' [৫৩]

বস্তুত,'রাজা' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশেষ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ভাবের নাট্যরূপ। এ লক্ষ্যেই পরিকল্পিত হয়েছে চরিত্র, ঘটনা; দৃশ্য-বিন্যাস ও প্রযুক্ত

---

memories' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড),পূর্বোক্ত , পৃ. ৩১১।

৫১. লেনিন , ধর্ম প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৭।

৫২. রবীন্দ্র গুপ্ত , সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি, কলকাতা ,১৯৮৩, পৃ. ৯৮।

৫৩. উৎপল দত্ত , জপেন দা জপেন যা, কলকাতা ,১৯৮৪, পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে প্রচুর গান (২৬টি), যার বেশিরভাগ গীতবিতানে প্রেম ও পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং কবির মতে, রাজা চরিত্রটি এখানে শুধু দেশের রাজা নন, অলীক বিশ্বরাজ, অরূপ-ভগবান। তাই এত সব অলীক ভাব ও বিষয় পরিস্ফুট করার জন্য যে সামাজিক সমস্যা চলে এসেছে,তার বাস্তব সমাধান আশা করাও হয়ত সঙ্গত নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত অধ্যাত্মরসের নাটক হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অচলায়তন : 'অচলায়তন' (১৯১১) রচনার দেড় মাস আগে কবির বয়স হয় পঞ্চাশ। কলকাতার 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' এ কারণে তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে অভিনন্দন জানানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এক দল লোক জন্মোৎসবের বিরোধিতা করে এবং কবিকে এ উদ্যোগের প্ররোচক সন্দেহে নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকে। স্বভাবতই কবি এতে দুঃখিত হন এবং উদ্যোক্তাদের বলেন এ কাজে বিরত হতে। কবি আর কলকাতা গেলেন না। ছাত্র,অধ্যাপক ও কর্মীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনেই উদযাপিত হয় কবির পঞ্চাশতম জন্মদিন। কলকাতা থেকেও আসেন বহু ভক্ত। কবি কিন্তু পুরোপুরি খুশি হতে পারেন নি। নিরুদ্ধ অভিমান নিয়েই যেন তিনি চলে যান শিলাইদহ এবং সেখানেই রচনা করেন 'অচলায়তন' নাটক। নাটকটি প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং পরে (১৯১২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে একই নাটক সংক্ষিপ্ত ও অভিনয় উপযোগী করে পুনর্লিখিত হয় 'গুরু' নামে।

'অচলায়তনে'র কাহিনীতে আছে : আচার্য অদীনপুণ্যের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত বিদ্যাপীঠ এক সময় প্রাণহীন প্রথা ও যুক্তিহীন সংস্কারের অনুবৃত্তিতে এক অচলায়তনে পরিণত হয়। পুথি ও শাস্ত্রের অনুশাসনে শিক্ষার্থীদের প্রাণের বিকাশ হয়ে ওঠে রুদ্ধ, বিকৃত। এমন কি উঁচু প্রাচীরঘেরা এই অচলায়তনে বিভিন্ন রকম পাপের ভীতিতে স্বাভাবিক আলো বাতাসও প্রবেশ করতে পারে না। এ সমস্ত নিয়ম –নীতির মধ্যে ছাত্র পঞ্চকই একমাত্র ব্যতিক্রম। অচলায়তনের অনুশাসনগুলোর কোন বাস্তব যুক্তি খুঁজে না পেয়ে সে শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এতে পঞ্চকের বড় ভাই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপঞ্চক খুবই উদ্বিগ্ন। কিন্তু আচার্য পঞ্চকের প্রতি স্নেহশীল। পঞ্চকের মধ্যে তিনি যেন সত্যিকারের প্রাণধর্মের স্পন্দন খুঁজে পান।

Dhaka University Institutional Repository

এক দিন আশ্রমবালক সুভদ্র সহজাত কৌতূহলে অচলায়তনের উত্তর দিকের শাস্ত্রকথিত একজটা দেবীর জানালা খুলে ফেলে । এ নিয়ে ভীষণ আলোড়ন শুরু হয় অচলায়তনে। সবাই সুভদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলে। কিন্তু সুভদ্রকে নিরস্ত করেন স্বয়ং আচার্য এবং পঞ্চক। এতে আশ্রমের পণ্ডিত ছাত্র সবাই মিলে আচার্য ও পঞ্চককে বিতাড়িত করে। তাঁরা এসে আশ্রয় নেন অচলায়তনের পাশে অস্পৃশ্য দর্ভক পল্লীতে। একদিন শোনা গেল অচলায়তনের গুরু আসবেন। কিন্তু নির্বাসিত আচার্য ছাড়া তাঁকে আর কেউ চেনে না। এ দিকে গুরু সরাসরি অচলায়তনের দ্বার দিয়ে না এসে অন্ত্যজ শোণপাংশুদের নিয়ে প্রাচীর ভেঙে প্রবেশ করেন। এতে আয়তনের অবরুদ্ধতা গেল ঘুচে। সবাই দেখল এই গুরু আর কেউ নন, সবারই পরিচিত শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের গোঁসাই। অবশেষে সবাইকে নিয়ে দাদাঠাকুর আবার নতুন এক আয়তন গড়ে তোলায় ব্যাপৃত হন।

এ নাটক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ভগবৎ সাধনার ক্ষেত্রে বাধা অপসারণের নাট্যরূপ। তাঁদের মতে, অচলায়তনের বাসিন্দারা হলো জ্ঞানবাদী, শোণপাংশুরা কর্মবাদী এবং দর্ভকরা ভক্তিবাদী। তারা প্রত্যেকে আপন গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল বলে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের বিচ্ছিন্নতায় সাধনা বিঘ্নিত হচ্ছিল। গুরু এসে সবাইকে স্থিত করে তৈরি করলেন সাধনার পথ। প্রমথনাথ বিশী [৫৪] ও আশুতোষ ভট্টাচার্য[৫৫] এ রকম মত দিয়েছেন।

৫৪. 'মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে ; শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে ;এবং দর্ভক দলের অচলায়তনের সাধনা ভক্তিমার্গে। এই তিন দল বিভিন্ন তিন মার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তিন মার্গের মধ্যে তাহারা কোনরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করে নাই, তাহারা নিজ নিজ সাধন পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা বলিয়া ভাবিয়াছে, সেইজন্য কেহই গুরুর প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারে নাই অথচ তিন দলই একই গুরুর অন্বেষণ করিতেছে'।

প্রমথনাথ বিশী , রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৭৭।

৫৫.'শোণপাংশুরা কর্মচঞ্চল জাতি। একটা কিছু করিতে পারিলেই তাহারা খুশী। ... ...ইহাদের কর্মস্পৃহা কোন লক্ষ্যে তাহাদিগকে লইয়া যায় নাই। ... ... দর্ভকরা অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু ইহারা রসের সাধনা করিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কারও কারও মতে, অচলায়তন ভারতবর্ষের প্রতীক। শোণপাংশুরা হলো বিভিন্ন সময়ে আগত বিদেশী জাতিসমূহ। আর দর্ভকরা এখানকার অনার্য নিম্নশ্রেণীর মানুষ। ভারতবর্ষ সবাইকে তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যসহ আত্মস্থ করে বৃহতের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে চলেছে। [৫৬]

সার্বিক বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, ১৯০৮ সালে 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা' , 'সদুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'র কিছু কবিতা ও গানে সবাইকে নিয়ে এক ভারতবর্ষ গড়ার এবং সবার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'খেয়া'র প্রার্থনায় আছে :

আমি বিকাব না কিছুতে আর

আপনারে

তাহারা ভক্তি পথের পথিক। এই সাধনাতেও অন্ধতা আছে। এই অন্ধতা যুক্তিহীন বিশ্বাসের, কর্মহীন শান্তির'। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।

৫৬. ' অচলায়তন আমাদের ভারতবর্ষ। অতি সুপ্রাচীনকালে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আদি-গুরু সাধনক্ষেত্ররূপে তপোবনরূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই আদিগুরু উপনিষদের ঋষিরা। তাঁহাদের সাধনা ছিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের পথে মুক্তির সাধনা। তারপর সাধনার উদ্দেশ্য কেন্দ্রচ্যুত হইল , এই সাধনায় নানা বাধা ও জঞ্জাল সৃষ্টির ফলে শেষে অচলায়তনের মত সংকীর্ণ বদ্ধরূপের মধ্যে ইহা আবদ্ধ হইল। ... ...। তারপর যেন ভগবানের ইঙ্গিতে অদৃশ্য গুরুর পরিচালনায় বাহির হইতে উন্মুক্ত কর্মপন্থীর দল সেই প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া সেই অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িল। ... ... । ইহারাই শক, হুন , যবন, পারদ, পাঠান, মোগল এবং শেষে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি। এই শোণপাংশুর দল বার বার ভারত অচলায়তনে ঢুকিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া বাইরের আলো-হাওয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে। তারপর ভারত তাহাদের গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সমস্ত শক্তি নিজেদের শক্তির সহিত মিশাইয়া নতুন করিয়া, বৃহৎ করিয়া আয়তন গড়িয়াছে। .... এই সমন্বয়-সাধনের শক্তি ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তি – ইহাই তাহার সভ্যতার প্রাণবস্তু। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক সারে।[৫৭]

'গীতাঞ্জলি'র ১০৬ সংখ্যক (ভারততীর্থ) গানে এ মনোভাব অধিকতর মূর্ত হয়ে উঠেছে :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমান ভার।
... ...
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে। [৫৮]

এ ছাড়া 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'য়ও তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে নতুন সত্য সভ্যতার জন্ম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। [৫৯]

এ সব উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, সর্বমানবের ঐক্যে ভারতবর্ষ গড়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা কবি এতদিন পোষণ করে আসছিলেন তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে

৫৭. খেয়া , রবীন্দ্র রচনাবলী ,১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত ,পৃ.১৮৪।

৫৮. গীতাঞ্জলি, ঐ, ১১শ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৮৪।

৫৯. 'ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে – ভয় নেই, কোন অভাব নেই – এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দ ভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পঙ্‌ক্তিতে বসে যাবে।' 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' , রবীন্দ্র রচনাবলী , ১৬শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯১,পৃ. ৩৭৭।

– এ ছাড়া 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪),'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০৫), 'তপোবন' (১৯০৯) ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'অচলায়তন' নাটকে। অবশ্য শেষোক্ত জাতি ইংরেজ যে মূলত সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা নিয়েই এসেছিল তা কবি তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। [৬০] তবে 'অচলায়তন' নাটকে সংস্কারাচ্ছন্ন জড় হিন্দু সমাজকে যে তীব্র আঘাত করা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ভারতবর্ষে জন্মসূত্রে নির্ধারিত বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস ও বর্ণাশ্রম প্রথায় যে অস্পৃশ্যতার সংস্কার ছিল তার বিরুদ্ধে এ নাটক বেশ বড় আঘাত। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অপবিত্র আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে। বংশ পরম্পরায় এ ধারা সৃষ্টি করেছে এক অমানবিক অবস্থা। এতে শূদ্ররা সর্বনিম্ন শ্রেণীর ও অস্পৃশ্য। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মূল শ্রমজীবী শ্রেণী এরাই। এ দিক থেকে ভারতীয় শ্রমজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত তো বটেই, সামাজিক দিক থেকেও নিগৃহীত, অপাংক্তেয়। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও খ্রিস্টান তথা ইংরেজও তাদের চোখে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'অস্পৃশ্য'। সহজেই ধারণা করা চলে যে, অচলায়তন নাটকের শোণপাংশুরা এই মুসলমান ও ইংরেজদের প্রতিনিধি এবং দর্ভকরা এ দেশের অবহেলিত শূদ্র শ্রমজীবী ।[৬১] অতএব, তাদের দিয়ে সনাতন হিন্দু সমাজের প্রতীক অচলায়তন ভেঙে ফেলা চিরকালের অবহেলিত বিরাট এক মানবগোষ্ঠীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার এক দুঃসাহসী প্রয়াস। এ চেষ্টা মানবিক চেতনায় ভাস্বর এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অগ্রসর চিন্তার পরিচায়ক। নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে মন্ত্রসর্বস্বতা ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে যে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে এ সবের অসারতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট।

৬০. আশি বছর বয়সে এসে তাঁর এ মোহ যে ভেঙেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। 'সভ্যতার সংকট' , ঐ, ২৬শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৪ ,পৃ. ৬৩৫।

৬১. 'আলোচ্য নাটকে (অচলায়তন) অঙ্কিত ম্লেচ্ছ, শোণপাংশু এবং অস্পৃশ্য দর্ভক যে কাদের ছদ্মনাম, তা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। এদের যথাক্রমে মুসলমান ও নিম্নস্থানীয় হিন্দুদের রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে , এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।'স্বরোচিষ সরকার,' অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ' , সীমার মাঝে অসীম (সম্পা. আবু হেনা মোস্তফা কামাল), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন :

মহাপঞ্চক। ... ... আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও।

ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণপায় ঘুণপায় স্বর বসত্ত্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় – আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ কর বলছি।

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি – এ মন্ত্রটার ফল কী ?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদয় – সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়। দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি। [৬২]

এ ধরনের অযৌক্তিক মন্ত্রোচ্চারণ যে জড়বুদ্ধিকেই আহ্বান করে তার উল্লেখ আছে নাটকে :

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর ,আমরা যাই। ও একটু পড়ুক (গমনোদ্যত)

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয় –

বিশ্বম্ভর। কেন আবার ডাকো কেন ?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয় –

সঞ্জীব। কী হয়েছে ? পড়ো -না !

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের একেবারে চলে যেয়ো না ; ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে, জগৎটা বিধাতা পুরুষের প্রলাপ নয়। [৬৩]

এক জায়গায় অস্পৃশ্যতার অযৌক্তিকতা নিয়ে বলা হয়েছে :

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চক দাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু

---

৬২ অচলায়তন, রবীন্দ্র রচনাবলী , ১১শ খণ্ড, ঐ, পৃ.৩১০।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

রাগ করবেন ?

পঞ্চক। বলতে পারি নে – কী জানি যদি অপরাধ নেন।

ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস – সেই টে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো ?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি , খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি ।

... ... গান ... ...

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও সহ্য হয় – কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস ।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি ।

পঞ্চক। কাঁকুড় ! ছি ছি ! খেঁসারি ডালেরও চাষ করিস বুঝি ?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না ? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারি ডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায় ; কিন্তু জানিসনে কাঁকুড় আর খেঁসারি ডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে। .....

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না ?

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই – কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।[৬৪]

লক্ষণীয় যে, পুরাতন অযৌক্তিক সংস্কার এবং জড়তার অচলায়তনে এ আঘাত যে তৎকালীন সমাজে আলোড়ন তুলবে তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন। এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মত হলো :

> অচলায়তন লেখায় যদি কোন চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথাই লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। [৬৫]

৬৪. ঐ , পৃ. ৩৩০-৩৩১।

৬৫. ঐ , পৃ. ৫০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে কোন কোন সমালোচক 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথকে 'সশস্ত্র-সমাজ বিপ্লবের' সমর্থক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। [৬৬] কথাটি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য সব সময় সর্বপ্রকার শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে সক্রিয় সংগ্রামশীলতা। কিন্তু এ নাটকে অর্থনৈতিক শোষণ নিরসনের প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। যে পরিবর্তন এখানে প্রার্থিত তা মুখ্যত ধর্মীয়, গৌণত সামাজিক। কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাম্য এবং উৎপাদনের সুষম বন্টন ব্যবস্থা ছাড়া উক্ত লক্ষ্য যে স্থায়ী হবে না তা অস্বীকারের উপায় নেই।

তাই প্রথমত, ধর্মীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এখানে আসে নি। অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার সংগ্রামে একজন গুরুর অবিসংবাদী নেতৃত্ব আধ্যাত্মিকতাই প্রতিষ্ঠা করে। সে সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্রসর্বস্ব ধ্যানমগ্ন মহাপঞ্চককে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের গুণকীর্তনই পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

মহাপঞ্চক। ... ... আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম – যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না। ....

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদা ঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা ? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না।

দাদা ঠাকুর। শাস্তি দেবে ! ওকে স্পর্শও করতে পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।[৬৭]

দ্বিতীয়ত,নতুন আয়তন গড়ে তোলার সময় স্থান পায় নি কোন প্রকার নতুন অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক বিন্যাসের প্রসঙ্গ। ফলে এটা বলা যায় না যে, পরবর্তী আয়তনে শোষণের

৬৭. অচলায়তন , পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্যবস্থা থাকবে না। যদি শোণপাংশুদের মধ্যে ইংরেজকেও ধরা হয় তাহলে এ নাটক প্রকারান্তরে ভারতে ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত কাঠামোর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয় সমর্থক বলে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, রবীন্দ্র-চিন্তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মিলনের ধারণা বহু কাল ধরে সক্রিয় ছিল । বিশেষ করে যখন দেখা যায়, ১৯২৬ সালে ইতালিতে স্বৈরাচারী মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও তিনি ব্যক্ত করেছেন অনুরূপ ধারণা। [৬৮]

উক্ত বিষয়সমূহ বিচারে , 'অচলায়তন' নাটকে 'সশস্ত্র সমাজবিপ্লব' প্রচার করা হয়েছে বলা যায় না। সংস্কারের জড়তার পরিবর্তে এ নাটকে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রহ্মমুখী করার চিন্তা। এ জন্যেই অচলায়তনের গুরু, শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের গোঁসাই এক দেহে লীন। অর্থাৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত বহু বিচিত্র প্রাণধারার মূল উৎস এক এবং অভিন্ন। অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতার মন্ত্রেই মানুষের জীবনসাধনা বা অধ্যাত্মসাধনার সাফল্য নিহিত। এই মন্ত্র-বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এখানে অস্বীকার করছেন না। অস্বীকার করছেন মনন-বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ প্রথা। 'অচলায়তনে'র সমালোচক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই । ... ... মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা । ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে নিক্ষিপ্ত করা হয় মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী

---

৬৮. রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনি কথোপকথনের কিছু অংশ কবির ব্যক্তিগত সচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখে রেখেছিলেন। তা থেকে Alex Aronson- এর উদ্ধৃতি :

'R. ... ... The present moment offers a great opportunity for a true unity of East and West. It will have great significance in history, and I hope we shall succeed in our efforts.'

RABINDRANATH THROUGH WESTERN EYES. RDDHI EDITION, 1978, p.63 ।

Dhaka University Institutional Repository

হইতে পারে।[৬৯]

বস্তুত, যথার্থ অধ্যাত্ম সাধনার বিঘ্ন মন্ত্রসর্বস্বতাকেই রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ভাবে 'অচলায়তন' নাটকে এক সংস্কারের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অধ্যাত্ম সাধনার অপর এক সংস্কার। তাই এ নাটক লেখকের সচেতন উদ্দেশ্যের দিক থেকে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন পুরোপুরি ধারণ করতে পারে নি। তবে, লেখকের রচনায় তাঁর মানসদৃষ্টির পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত চেতনার সৃজনশীল প্রকাশও ঘটতে পারে। 'অচলায়তন' নাটকে তা ঘটেছে বলে মনে করা যায় । এখানে অস্পৃশ্যতার অমানবিক সংস্কার বিরোধিতার পাশাপাশি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী-লালিত রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীত মতাদর্শ। যিনি পেশীশক্তিতে কিংবা অস্ত্রের সাহায্যে দাবি আদায় ও শত্রুনিধনের বিরোধী তিনিও বাস্তবতার নিরিখে এ নাটকে অস্ত্র ব্যবহার, এমন কি মৃত্যুকেও সংগ্রামের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে অত্যাচারী রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাতে যাওয়ার সময় কৃষকরা হাতিয়ার নিতে চাইলে তাতে বাধা দিয়েছিল ধনঞ্জয় বৈরাগী। অথচ এ নাটকে ব্রহ্ম সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় করাকেও স্বাগত জানিয়েছেন ('কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।')।[৭০] ধারণা করা চলে, অন্তত শোণপাংশুদের দ্বারা অচলায়তন আক্রমণের দৃশ্য উপস্থাপনার প্রেরণা এসেছে এ অঞ্চলের জমিদার ও ইংরেজ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্য থেকে।[৭১] রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে এ ধরনের বিদ্রোহ সমর্থন করতে না চাইলেও তাঁর অনন্য শিল্পীসত্তায় এ ঐতিহ্যের

---

৬৯. অচলায়তন (গ্রন্থ পরিচয়) , পূর্বোক্ত, পৃ.৫০৬-৫০৭।

৭০. অচলায়তন, ঐ, পৃ.৩৬৭।

৭১. এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, এ আক্রমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শোণপাংশুরা পুরোপুরি সচেতন ছিল না। এ দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহের বিষয়ের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। তাই, দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোণপাংশুদের আক্রমণকে সশস্ত্র সমাজ বিপ্লব বলা মুশকিল।

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব যুগপৎ ক্রিয়াশীল ছিল।[৭২] এবং এই ক্রিয়াশীলতাই 'অচলায়তন' নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে সমাজের বাস্তব উপাদানসমৃদ্ধ কাহিনী কাঠামোর সাযুজ্য ঘটিয়েছে যার অভিঘাতে তৎকালীন সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল কবির কাঙ্ক্ষিত চাঞ্চল্য। বস্তুবাদী সমালোচনার দৃষ্টিতে, নাট্য উদ্দেশ্যের শাস্ত্রীয় ত্রুটির চেয়ে উপরি-উক্ত সাফল্য বেশি বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। সে সঙ্গে এও প্রত্যক্ষ করা যায় যে, অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুটা হলেও চলতে শুরু করেছেন সমাজ বাস্তববাদী পথে। এ দিক থেকে 'অচলায়তন' নাটক একটি মাইল ফলক।

ডাকঘর : 'ডাকঘর' (১৯১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল আলোচিত নাটক। এটি রচনার সময় তিনি অবস্থান করছিলেন শান্তিনিকেতনে। এ সময় আর্থিকভাবে কিছুটা অসচ্ছলতা ছিল বলে জন্মোৎসব পালনের জন্য গৃহীত ঋণ তখনো শোধ হয় নি। পাশাপাশি চলছিল অর্শরোগের চিকিৎসা। ভাবছিলেন, হাতে কিছু টাকা হলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে 'আয়ুর প্রদীপকে আর একবার' উস্কে দিয়ে আসবেন। শারীরিক ও মানসিক অবস্থার এ পর্যায়ে লিখলেন ছোট নাটক 'ডাকঘর'। [৭৩]

শান্তিনিকেতনবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া এক বক্তৃতায় তিনি এ নাটক সম্বন্ধে বলেন :

> ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু উৎসবের জন্য লিখিনি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম,প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল,চল,বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে

---

৭২. 'এই নাটকটির রচনার মূলে কবির বাস্তব সমাজবোধ ও মানবীয়তাবোধ বিশেষভাবে কাজ করেছে এবং কবি যেহেতু অরূপাদর্শে সমাজের গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই হেতু এখন থেকে এই অনুমান করা যায় যে, কবি শুধু অরূপ সাধনাতেই সমাহিত থাকবেন না, বাস্তব জীবনের মধ্যে অরূপকে এবং অরূপের মধ্যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করবেন।' ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় , কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৭।

৭৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্রজীবনী , দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দু'টো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল,একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই,এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। [৭৪]

'ডাকঘর' রচনার এই ছিল পটভূমি। এ নাটকের আখ্যানে বলা হয়েছে :

নিঃসন্তান মাধবদত্ত ঘোর বিষয়ী লোক। তার সম্পত্তি আছে প্রচুর কিন্তু ভোগ করার উত্তরাধিকারী নেই। তাই স্ত্রীর এক অনাথ ভাইপো অমলকে সে গ্রহণ করে পোষ্য হিসেবে। ছেলেটিকে সে আদর যত্ন করে । কিন্তু অমল খুব অসুস্থ। তাই মাধবদত্তের ভাবনার শেষ নেই। কবিরাজের মতে শরতের রোদ হাওয়া ছেলেটির স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অমলকে প্রায় আলো বাতাসহীন ঘরে থাকতে হয়। তার কিশোর প্রাণ বাইরে যাওয়ার জন্য ছটফট করে। একটি আধখোলা জানলার পাশে বসে সে বুভুক্ষুর মতো তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। নীল আকাশ, দূরের পাহাড়, পাহাড়ি ঝরণা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রাস্তার পথিক, ফেরি-অলা, প্রহরী, হরকরা ,বালকের দল সবাইকে ডেকে ডেকে সে গল্প করে। পায়ে মল বাজিয়ে ফুল তুলতে যায় শশী মালিনীর মেয়ে সুধা। অমল সুধার কাছে ফুল চায়।

এক দিন তাদের বাড়ির সামনে বসে রাজার ডাকঘর। প্রহরী তাকে জানায় রাজা

৭৪. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯, পৃ.২০১-২০২।

Dhaka University Institutional Repository

তাকেও চিঠি লিখবেন। গাঁয়ের মোড়ল বিদ্রূপ করে অমলের হাতে এক টুকরো সাদা কাগজ দিয়ে বলে রাজার চিঠি এসেছে তার কাছে। অমল সে কথা বিশ্বাস করে তা পড়ে দিতে বলে ঠাকুরদাকে। ঠাকুরদা অমলকে কষ্ট দিতে চান না। তাই তিনি বানিয়ে বানিয়ে বলেন, এ সত্যিই রাজার চিঠি ; রাজা লিখেছেন, রাজকবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অমলকে দেখতে আসবেন। দেখা গেল সে রাতে সত্যিই রাজদূত ও রাজকবিরাজ দরজা ভেঙে এলেন অমলের কাছে। রাজকবিরাজ খুলে দিলেন ঘরের সমস্ত জানালা দরজা। দূর আকাশের তারার আলো এসে পড়লো সে ঘরে। তখন অমলের চোখে নামলো ঘুমের ঢল। এমন সময় ফুল নিয়ে এসে সুধা জানতে চাইলো অমল কখন জাগবে। রাজকবিরাজ বললেন, রাজা এসে ডাকলেই অমল জেগে উঠবে। সুধা চলে যাওয়ার সময় বললো, অমল জেগে উঠলে তাকে যেন কানে কানে বলা হয়, 'সুধা তাকে ভোলেনি।'

কবির মন্তব্য এবং নাটকের কাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক নাটক। তাই নাটকের সারা অবয়বে কবিকথিত 'যাই **যাই**' ভাবটি দেখা যায়। এই মৃত্যুচিন্তা নাটকে দুই ভাবে প্রকাশিত। প্রথম পর্যায়ে এটি অমলের সুদূরের প্রতি আকর্ষণ হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। [৭৫] এবং পরে মৃত্যু পরবর্তী জগতের আভাসের সঙ্গে বাস্তব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। [৭৬] কয়েকটি উদ্বৃতির মাধ্যমে এটি লক্ষ্য করা যায় :

এক . সুদূরের প্রতি আকর্ষণ :

---

৭৫. 'বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব।'

অজিত কুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা, কলকাতা , ১৩৯৫, পৃ.১২৪।

৭৬. 'মৃত্যুর দ্বারাই নির্মল, নিষ্পাপ আত্মা তাহার চিরন্তন , মুক্ত আনন্দময় সত্তা ফিরিয়া পায় এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করে। মৃত্যু তো শেষ নয়, ধ্বংস নয়, অবলুপ্তি নয়, – সে তো নবজীবনের সিংহদ্বার, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের অবতরণিকা, সে তো মানবের পরম বন্ধু ।' উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য -পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক) অমল। ... ... আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই – যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।[৭৭]

খ) অমল। আমাদের জানালার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় – আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই। [৭৮]

দুই. মৃত্যুপরবর্তী জগতের আভাস এবং মৃত্যু :

ক) অমল। ... ... তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোন জিনিসের কোন ভার নেই – যেখানে শুধু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, ... আচ্ছা ফকির সে দেশে কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়।

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।[৭৯]

গ) ঘুমের প্রতীকে অমলের মৃত্যু দৃশ্যে রাজকবিরাজ -এর সংলাপ : ... ... এইবার সকলে স্থির হও। এলো, এলো ওর ঘুম এলো। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিভিয়ে দাও এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক। ওর ঘুম এসেছে।

মাধবদত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন ? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি সব কি ভালো লক্ষণ ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন ! তারার আলোতে আমার কী হবে !

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কয়োনা।[৮০]

'খ' উদ্ধৃতির দৃশ্যে অন্ধকার ঘরে কেবল তারার আলোতে অমলের নিষ্পাপ আত্মাকে যেন অসীম, অনন্ত সৌন্দর্যলোকে পাঠাবার নিপুণ আয়োজন রচিত হয়েছে। এমন কি অমলের আত্মার সেই যাত্রাকে ঠাকুরদা সম্মানও জানিয়েছেন জোড় করে। কারণ,এই মৃত্যু কেবল

৭৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড , পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৮৯।

৭৮. ঐ , পৃ. ৩৮৪।

৭৯. ঐ , পৃ. ৪০০।

৮০. ঐ , পৃ. ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইহজীবনের অন্তিমতা ঘোষণা করছে না বরং এ দেহখাঁচা ফেলে জড়ের বন্ধন ঘুচিয়ে অসীম অনন্ত ভগবান বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ রচনা করে দিচ্ছে। জার্মানি ভ্রমণের সময় সেখানে 'ডাকঘর' প্রযোজনা দেখে কবি এন্ডরুজকে লিখেছিলেন :

> অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে। মানী লোকের কড়া মতামতের খাড়া দেয়াল আর অভিজ্ঞ লোকের বিধিবদ্ধ অভ্যাসের বেড়া এ সবের হাত থেকে সে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু বিষয়ী লোক মাধব দত্ত তার চঞ্চলতাকে মারাত্মক রোগের লক্ষণ বলে ধরে নিলে। ... ... এ দিকে জানালার সামনে ডাকঘর বসেছে। অমল রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে। সে চিঠি রাজার কাছ থেকে তার মুক্তির বাণী নিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত রাজবৈদ্য এসে দ্বার খুলে ফেললেন। প্রচলিত ধর্মবিধি ও বিষয়বিত্তের জগতে যা মৃত্যু বলে পরিচিত,তাই অমলকে আত্মার মুক্তলোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিলে।[৮১]

সমালোচক P. Guhathakurta [৮২] এ মত সমর্থন করলেও প্রমথনাথ বিশী [৮৩] ও ক্ষুদিরাম দাস [৮৪] অমলের দৈহিক মৃত্যুকে স্বীকার করতে চান নি।

৮১. রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনু.মলিনা রায়, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭ , পৃ. ১২২-১২৩।

৮২. 'All is quiet now. The oil lamp is blown out for the star-light to stream in. Hush, Amal sleeps. His life's day is done.' P.Guhathakurta, The Bengali Drama : Its Origin and Development, London, 1993, p.202।

৮৩. তাঁর মতে, 'ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।' 'বিশেষ অমল তো মরে নাই ; স্পষ্টই উল্লিখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।' রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত , পৃ. ২১৭।

৮৪. তাঁর ধারণা, 'শেষ দৃশ্যে অমলের নির্মীলিতাবস্থা যে মৃত্যু এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আর সুধার উক্তি অনুসারে, অমল পৃথিবী থেকে বিযুক্তও নয়। অরূপানুভব জীবনেই লভ্য।' রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, পূর্বোক্ত , পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, এখানে ঘুমের প্রতীকে মৃত্যুই বোঝানো হয়েছে । তা নাটকের দৃশ্য সংস্থাপনে , চরিত্রের সংলাপ ও আচরণে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে 'ডাকঘর' প্রযোজনা দেখে এন্ডরুজকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতেও মৃত্যুর কথাই স্বীকৃত (টীকা ৮১ দ্রষ্টব্য) । আর প্রমথনাথ বিশী নিজেও যখন বলেছেন যে, মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি, তখন এই পার্থিব মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

সুদূরের প্রতি ও মৃত্যুর প্রতি কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির অজস্র নিদর্শন রবীন্দ্র সাহিত্যের বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। এমন কি স্থূল দেহের বন্ধন থেকে মানবাত্মাকে গ্রহণ করার জন্য পরম পুরুষের আগমনকে কবি এর আগে এবং পরে কয়েকটি গানে দুয়ার ভেঙে গৃহে প্রবেশ করার অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'উৎসর্গ' (১৯১০) কাব্যের 'আমি চঞ্চল হে' কবিতায় (পরে গান) তা ছিল এরকম :

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী
দিন চলে যায় , আমি আনমনে
তারি আশায় চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো , প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী। [৮৫]

'গীতাঞ্জলি' র একটি গানে বলা হয়েছে :

যে রাতে মোর দুয়ার গুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো ,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম

৮৫. 'উৎসর্গ ' (৮ সংখ্যক কবিতা), রবীন্দ্র রচনাবলী ,১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

কাহার তরে। [৮৬]

'গীতালি'তেও পাই তেমনি একটি গান :

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।[৮৭]

'ডাকঘর' নাটকে ঐ ভাবগুলো ছাড়া কবির আরও একটি বিশেষ উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তা হলো , বিশ্বচরাচরের সমস্ত কর্মযজ্ঞে এক আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি। রবীন্দ্র-মানসের একটি অন্যতম উপাদান – খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, সসীমের মধ্যে অসীমের লীলা প্রকাশের উপলব্ধি। অমলের কয়েকটি সংলাপে এবং ভাবনায় এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই ডাক হরকরার পরিশ্রম, প্রহরীর ঘণ্টা বাজানো, দূরের পথিক, সুভা ও অন্যান্য বালকের সঙ্গ এত ভালো লাগে অমলের। দই-অলাকে সে বলে :

> না না আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাস্তার ধারে, তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল দই, দই, দই – ভাল দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও। [৮৮]

এবং প্রহরীকে বলে :

> বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা – আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায় – পিসেমশায় কোথাও কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং,ঢং ঢংঢং। [৮৯]

---

৮৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৮৪ ।

৮৭. ঐ , পৃ. ২৮৭।

৮৮. ঐ , পৃ. ৩৮৭।

৮৯. ঐ , পৃ. ৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি ডাক হরকরার রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধনী-গরিব সবার ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগে অমলের।

বস্তুত, জীবন ও জগতের সমস্ত কাজের মধ্যে,সত্তার মধ্যে অমলের অফুরান আনন্দের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিষদিক ঈশ্বর বিশ্বাসের বিশেষ প্রকাশ। ছোটবেলায় উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর মনে এই উপলব্ধির সূত্রপাত ঘটে [৯০] এবং 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার সময় বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর অন্বয় সাধিত হয়।[৯১]

---

৯০. 'এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত , বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ – এ ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।' 'মানবসত্য' ভাষণ . রবীন্দ্র রচনাবলী , ২০শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯২, পৃ. ৪২২।

৯১. 'একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। ..... সেইদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। ...

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। ..... রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে , 'কোথাও যাওয়ার ডাক', 'মৃত্যুর কথা' এবং পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মৃত্যু পরবর্তী অসীম আনন্দময় কোন জগতে চলে যাওয়া – এ সব কিছুকেই রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করেছেন। আর এই বিষয়সমূহ তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তার অনুবর্তী। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিষয়টিকে এ ভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন :

> বিশ্বের বাধাহীন, বন্ধনহীন,সীমাহীন পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছা মানবাত্মার সহজাত। ইহাতেই তাহার অসীমত্ববোধ পূর্ণ হয়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সমস্ত সৃষ্টি পরমাত্মার আনন্দরূপ, নিখিল বিশ্ব তাঁহারি বিচিত্র সৌন্দর্যের মহামহোৎসবক্ষেত্র। এই আনন্দরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যোগযুক্ত হওয়াই চরম আধ্যাত্মিক সফলতা। নিস্পাপ, অমলিন মানবাত্মা ইহাই তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। [৯২]

রচনার ব্যাখ্যা হিসেবে শুধু নয়, কবি ব্যক্তিগতভাবেও অনুরূপ বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন বলে নিম্নোক্ত তথ্য থেকে ধারণা জন্মে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> 'শেষ লেখা ' কাব্যের প্রথম গানটি (সমুখে শান্তি পারাবার) ডাকঘর নাটকের জন্য লেখা হয়েছিল, যা পরে সংযুক্ত হয় নি। কিন্তু কবির একান্ত অভিপ্রায় অনুযায়ী এটি তাঁর মৃত্যুর পর – ২২ শে শ্রাবণ সন্ধ্যায় এবং ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে গীত হয়।[৯৩]

উল্লেখ্য ,'ডাকঘর' নাটকে কোন গান সন্নিবিষ্ট না হলেও জোড়াসাঁকোর বিচিত্রায় প্রথম অভিনয়ে বাউলরূপী রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুরদা ও প্রহরীও) নেপথ্য থেকে গেয়ে উঠেছিলেন 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে' গানটি যা নাটকের মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৯৪]

ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না' জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী , ১৭শ খণ্ড, ঐ , পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

৯২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত , পৃ. ২৫৫।

৯৩. বিজ্ঞপ্তি , শেষ লেখা , রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ শ খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ৬৪৮।

৯৪.রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, এই 'আধ্যাত্মিক' দর্শন অধিবিদ্যাপ্রসূত যা বাস্তব পৃথিবী এবং লৌকিক জীবনকে এড়িয়ে যেতে চায়। আর লৌকিক জীবনই যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে এই পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা,অন্যায়-পীড়ন, শোষণ- বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয় হয়ে পড়ে গৌণ। আবার জগতের সব কিছুকে ভগবানের লীলার প্রকাশ বলে ধরে নিলে বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করা হয় এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যেই পরিতৃপ্তি খোঁজার দর্শন লালিত হয়। এই সূত্রে সেটি শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে এবং পরিণত হয় শোষক শ্রেণীর অস্ত্রে। এ সব বিবেচনা করে কোন কোন সমালোচক 'ডাকঘর'-কে 'অবক্ষয়ী' শোপেনহাওয়ারি নির্বাণচিন্তার নাটক, যে চিন্তার ভালো নাম আধ্যাত্মিক মুক্তি – Deliverance through death –বলে অভিহিত করেছেন।[৯৫]

কবির সচেতন আকাঙ্ক্ষা এবং নাট্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য প্রাথমিক বিবেচনায় একজন সমালোচককে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে মাও-সে-তুং-এর একটি উদ্ধৃতি সূত্রে দেখেছি – রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক যা-ই বলুন না কেন তার চেয়ে বেশি বিবেচ্য হবে ঐ রচনাটিতে কী প্রকাশ করা হয়েছে সেটি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যের চেয়ে নির্দিষ্ট রচনাটির গুরুত্ব বেশি। তাই অধ্যাত্মবাদের প্রাক-ধারণাসমূহ এড়িয়ে নাট্যকাহিনীর দিকে তাকালে দেখা যায়, এই নাটকের মৌল আকর্ষণ একটি কৌতূহলী মিশুক এবং উজ্জ্বল কোমলপ্রাণ বালকের করুণ মৃত্যু। সে এই বিপুল পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দময় অনুষঙ্গ প্রাণভরে উপভোগ করতে চেয়ে নিরাময়হীন রোগে আক্রান্ত হয়ে নিষ্ঠুর বিনষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। হৃদয়-মথিত এই মৃত্যুকে নাট্যকার স্বয়ং মুক্তির বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিযাত্রা হিসেবে দেখাতে চাইলেও সমস্ত কিছু ছাপিয়ে লৌকিক মৃত্যু এখানে প্রধান হয়ে ওঠে এবং দর্শক ও পাঠককে আক্রান্ত করে তীব্র মানবিক বিষাদে।

সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব এ জন্যেই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিকে নিষ্ঠুর বলে মন্তব্য করেছেন।[৯৬] বিশেষত, শেষ দৃশ্যে ক্ষুদ্র বালিকা সুধার অন্তিম

৯৫. প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস , 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব' ,অনুষ্টুপ, চতুর্বিংশ বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা , ১৯৯০ , পৃ. ৫৬।

৯৬. আবু সয়ীদ আইয়ুব , পান্থজনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্বাসে–'সুধা তাকে ভোলেনি'– সেই বেদনা হয় আরো প্রস্তরীভূত। সুধা যেন এ পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য ফুলের ডালিতে সাজিয়ে এনে অমলের প্রাণে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অমল চলে গেছে এ সবের বহু উর্ধ্বে। [৯৭] এই অতৃপ্তি, ব্যর্থতা ও বেদনা সর্বতোভাবে লৌকিক এবং মানবিক। পবিত্র সরকারও প্রায় একই মত ব্যক্ত করে বলেছেন, ' এখানে মুক্তি ও মৃত্যুর টানাপোড়েনে যে দ্ব্যর্থকতা তৈরি হয়, তাতে মুক্তির চেয়ে মৃত্যুর উপস্থিতিই হয়তো আমাদের কাছে বেশি'। [৯৮]

বস্তুত, অতীন্দ্রিয় সত্তার আহ্বানে অমলের আত্মার সাড়া দেওয়ার ভাবটিকে কবি যে কাহিনী কাঠামোয় স্থাপন করেছেন, তার বাস্তব উপাদানই এখানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অমলের মৃত্যু শুধু নয়, চলমান জীবনের যে সব ঘটনায় অমল আন্দোলিত হয়েছে , সে সবের দৃশ্যগুণও ছাড়িয়ে গেছে তাদের স্রষ্টার (নাট্যকারের) ইচ্ছাকে। ফলে, দই-অলার সুর করা ডাক, নিস্তব্ধ দুপুরে প্রহরীর ঘণ্টা, লাঠির মাথায় ছাতু বাঁধা পথিক, পাঁচমুড়া পাহাড়ের ধারে শামলী নদীতীরের গ্রাম, ঝরণার পানিতে পা ডুবিয়ে পাহাড়ের ওপারে চলে যাওয়া, দুপুরে পিসীমার রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া ইত্যাদি দৃশ্যে যে সুগভীর জীবনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায় তাকে কেবল সাংকেতিকতার ছকে ফেলা দুষ্কর। আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় :

> ডাকঘর-এর সার্থকতা তাহার সঙ্কেত নির্দেশের গুরুত্ব কিংবা সার্থকতার উপরও নির্ভর করে নাই, ইহার মধ্যে বাস্তব জীবন দর্শনের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে সার্থকতা দান করিয়াছে। [৯৯]

এ ছাড়া, প্রথমাবধি শারীরিকভাবে রুগ্ন একটি নিষ্পাপ বালকের অসহায় বন্দিত্ব নাটকে

৯৭. জোড়াসাঁকোর অভিনয়ে এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় দর্শকও এমনি মানবিক করুণায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলেন : এখনো যেন দেখছি, সমস্ত অভিনয়কক্ষ স্তব্ধ। এই রকম থাকে কতক্ষণ,তারপর দূর থেকে মল ঝম্ ঝম্ করে হাতে একটি ছোট ফুলের সাজি নিয়ে সুধা আসে। মিষ্টি কোমল গলায় ডাক দেয় : অমল ! আমাদের দু 'চোখে জল এসে যায়।' উদ্ধৃত, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী , পূর্বোক্ত , পৃ. ১৪৭।

৯৮. 'ডাকঘর : নাস্তিকের নিবিড় পাঠ' , পশ্চিমবঙ্গ ,রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪০২ , পৃ.১০১।

৯৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিষাদের ছায়া ফেলেছে তা অত্যন্ত সংযম ও পরিমিতির মাধ্যমে সমাপ্তিতে পৌঁছে মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। এই পরিমিতি ও সংযম নাটকটিকে প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হিসেবে। ফলে কবি পরিকল্পিত 'অনন্তের পথে যাত্রা' ভাবটি সমাপ্তি দৃশ্যের দুঃসহ আবেগকে কেবল শান্ত স্নিগ্ধ রূপদানেই যেন ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কবির অধ্যাত্ম ভাবনা এ নাটকে শেষ পর্যন্ত শৈল্পিক উপাদানরূপেই এসেছে এবং তা নাটকের গূঢ় নির্যাসে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি।

মুক্তধারা : 'ডাকঘর' রচনার পর কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের বসন্ত উৎসব উপযোগী একটি নাটক রচনা করেন 'ফাল্গুনী' (১৯১৫) নামে। একান্তই বসন্ত উৎসবের জন্য রচিত বলে এ নাটকে প্রচুর গান ও নৃত্যের ব্যবহার করা হয়, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব তেমন নেই বললে চলে। এর প্রায় ছয় বছর পর রচিত 'মুক্তধারা' (১৯২২) [১০০] থেকে তাঁর নাটকে ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা চলে , এই দশ এগার বছরের মধ্যে বিশ্বে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে যে সব যুগান্তকারী ঘটনা সংঘঠিত হয় তার প্রভাবেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে এ সময়ের আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং সে সঙ্গে কবির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) । ধ্বংস, মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে এই যুদ্ধ মানব ইতিহাসের আগের সব যুদ্ধকে ছাপিয়ে যায়। ইংল্যান্ড প্রায় প্রথম থেকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং কোন রকম অনুমতির তোয়াক্কা না করেই শুরু করে ভারতবর্ষের বিপুল অর্থ ও মানবসম্পদ ব্যবহার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় বার লাখ। এবং হাজার হাজার ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানের নামে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া হয়। [১০১] ভারতীয় সৈন্যদের অনেকটা জোর করে নেয়া হলেও কয়েক জন জাতীয় নেতা

১০০. 'মুক্তধারা' (রচনা : জানুয়ারি, ১৯২২) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩২৯) ; কিছুদিন পর কবির নিজের ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয় The Modern Review পত্রিকায় (মে, ১৯২২) এবং মূল নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে ১৯২২ সালের জুন মাসে।

Dhaka University Institutional Repository

(মহারাষ্ট্রের তিলক, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ) বেশ উৎসাহ নিয়েই ব্রিটিশরাজকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এর ফলে ব্রিটিশ সরকার তুষ্ট হয়ে যুদ্ধশেষে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবে ভারতকে।

যুদ্ধ শুরু হলে কবি শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা সভার আয়োজন করে বলেন , এর মধ্য দিয়ে বিশ্বে যে পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে 'বিশ্বানী দুরতানি পরাসুব।' [১০২] উল্লেখ্য, এর আগের বছরই কবি নোবেল পুরস্কারের ভুষিত হয়েছেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকারও তাঁকে সাহিত্য অবদানের জন্য দেন 'নাইটহুড' (স্যার) খেতাব। পরের বছর মে মাসে আমেরিকার এক বক্তৃতা ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে তিনি আমেরিকা রওনা হন। কিন্তু কয়েক দিন একই বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে প্রদান করে হয়ে পড়েন ক্লান্ত। অগত্যা চুক্তি বাতিল করে ১৯১৭ এর মার্চে দেশে ফিরে আসেন। দেশে তখন চলছে হোমরুল আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অ্যানি বেশান্তকে ব্রিটিশ সরকার বন্দী করলে (১৯১৭) উত্তেজিত কবি এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসভায় 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামে একটি প্রতিবাদী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তা ছাড়া কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলে সেখানে একটি কবিতাও পাঠ করেন কবি।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তির জয় হলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং তুরস্কের সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বেশ কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর ঠিক আগের বছর (১৯১৭) রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য কার্ল মার্কস উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্রের এই বাস্তবায়ন পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের মনে স্বাধীনতা ও সাম্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। ভারতের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরাও বলশেভিক রাশিয়ার মধ্যে দেখলেন একটি

---

১০১. সুপ্রকাশ রায় , ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস(প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত , পৃ.১৭০।

১০২. অভীক কুমার দে, 'মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা , পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাব্য শক্তি। [১০৩]

এ দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ব্রিটিশরা এদেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসন-তো দিলই না বরং এখানে যাতে কোনরূপ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা হিসেবে রাওলাট আইন (১৯১৯) পাশ করলে ভারতবাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। বিশেষ আদালত স্থাপন ও বিনা বিচারে সর্বোচ্চ দুই বছর আটক রাখার (এমন কি রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষিত কোন পুস্তিকা বাড়িতে রাখার মতো অপরাধেও) একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই আইনে ছিল নাগরিক অধিকারের ওপর যুদ্ধকালীন বাধানিষেধ স্থায়ী করার প্রচেষ্টা। [১০৪] ইতোমধ্যে গান্ধী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রধানত তাঁর আহ্বানেই এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারাদেশে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয় হরতাল ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের নব পর্যায়ের এই আন্দোলন লক্ষ্য করছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনিও ছিলেন উদগ্রীব। কিন্তু আন্দোলনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কিছুতেই গান্ধীকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। অহিংস বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যাপক জনতা সর্বাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকবে না এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বাস্তব অবস্থাও ছিল অনুরূপ। যেমন, ৬ই এপ্রিলের হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হলেও ৯, ১০ এবং ১১ তারিখে কলকাতা, পাঞ্জাবের অমৃতসর, বোম্বাই ও আহ্মেদাবাদে পুলিশের সঙ্গে জনতার তীব্র সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ গুলি চালালে হতাহত হয় বহু লোক । [১০৫] রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কয়েক জন মহান বীরই চরম আক্রমণের মুখেও অহিংস বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনোই নয়। এ নিয়ে তিনি গান্ধীর প্রতি একটি খোলা চিঠিও লেখেন যা ১৯১৯ সালের ১৬ই এপ্রিল 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি তাতে বলেন :

I know your teaching is to fight against evil by the help of

১০৩. সুমিত সরকার ,আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭ , কলকাতা , ১৯৯৫ , পৃ. ১৭৮।

১০৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৭৮।

১০৫. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত ,পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

the good . But such a fight is heroes' and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness . [১০৬]

পত্রিকায় এ চিঠি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন আগে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯) পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালবাগের মাঠে উৎসবে সমবেত নিরস্ত্র সুশৃঙ্খল মানুষের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ বর্বর প্রক্রিয়ায় গুলি চালায়। সরকারি হিসেবেই নিহত হয় ৩৭৯ জন এবং আহত হয় ১২০০ ব্যক্তি। [১০৭] ঘটনার নৃশংসতায় ভারতবাসী স্তম্ভিত হয়ে যায় অথচ তৎকালীন কংগ্রেস নেতা গান্ধী ব্রিটিশ পুলিশের চেয়ে দেশীয় জনতার সমালোচনা করলে দেশবাসী আরো ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। বিলম্বে খবর পেয়েও রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে যান কলকাতা। কিন্তু জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া লাভে ব্যর্থ হলে অগত্যা নিজেই তিনি এর প্রতিবাদ স্বরূপ ব্রিটিশের দেয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। ঐ বছর এপ্রিলের মাঝামাঝি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন গান্ধী । অবশ্য তা সত্ত্বেও ১৯১৯ -এর শেষ দিক থেকে ১৯২০ সালের মধ্য সময় পর্যন্ত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক ধর্মঘট। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কেবল ১৯২০ সালের দ্বিতীয় অর্ধে বাংলাদেশেই শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল ১১০টি। [১০৮]

১৯২০ সালের এপ্রিলে কবি সপরিবার ইউরোপ যাত্রা করেন। এবার ইংল্যান্ড গিয়ে আগের মত উষ্ণ অভ্যর্থনা না পেয়ে তিনি বুঝলেন এটা তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করার ফল। কবি বিচলিত হলেন না। বরং যেখানেই গেলেন, সেখানেই বললেন ভারতবাসীর দাবী দাওয়ার কথা। এমন কি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্য আদায়েরও ব্যর্থ চেষ্টা করেন । অবশেষে শান্তিনিকেতনে এন্ডরুজকে লিখলেন :

Our stay in England has been wasted .Your parliament

১০৬.নেপাল মজুমদার , ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকত এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খণ্ড , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

১০৭. R.Palme Dutt , India Today, Calcutta, 1986 , p. 338 ।

১০৮.সুমিত সরকার পূর্বোক্ত , পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

> debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of an arrogant spirit of comtempt and callousness about India have deeply grieved me, and it was with a feeling of relief that I left England. [১০৯]

ইংল্যান্ডে হতাশ হয়ে কবি তৃতীয় বারের মতো আমেরিকা যান। উদ্দেশ্য শান্তি-নিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহ। কিন্তু অর্থ সংগ্রহ- তো হলোই না, বরং 'জার্মান গুপ্তচরের' মিথ্যে অপবাদ নিয়ে তিনি পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। পরে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন ইত্যাদি ঘুরে দেশে ফেরেন কবি।

ভারতে তখন অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন যুগপৎভাবে চলছে। এ সময় কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়ে গান্ধী আসলেন শান্তি-নিকেতন। কবি তখন বিদেশে ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। এর কিছু দিন পর (৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২১) কলকাতায় গান্ধীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু দীর্ঘ চার ঘন্টার আলাপচারিতার কোন তথ্য কেউ জানতে পারে নি। রবীন্দ্র জীবনীকার লিখছেন :

> দুই মহাপুরুষের মধ্যে যে দীর্ঘ আলোচনা হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। গান্ধীজি যথারীতি তাহার অসহযোগ আন্দোলনের ইন্ধন সন্ধানে বাহির হইলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিলনমূলক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনায় মন দিলেন। [১১০]

এর পর পরই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান এবং পুনরায় কাব্য সংগীত এবং নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। কয়েক মাস পর রচিত হয় 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটক। এর কাহিনীতে বলা হয়েছে: উত্তরকূট রাজ্যের করদ রাজ্য শিবতরাই। উত্তরকূট হয়ে শিবতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে একটি নদী মুক্তধারা। শিবতরাইয়ের খাবার এবং চাষের জল এই নদী থেকেই পাওয়া যায়। করদ রাজ্য হলেও শিবতরায়ের কৃষকরা দুর্ভিক্ষের কারণে দুই বছর যাবৎ উত্তরকূট-রাজা রণজিৎকে খাজনা দিচ্ছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে যুবরাজ অভিজিৎকে শিবতরাইয়ের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রজার

১০৯.নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত ,('Letters to a friend' থেকে উদ্ধৃত), পৃ.৭৪।

১১০.প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৯৭ , পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সহানুভূতিশীল অভিজিৎ বাকি খাজনা তো আদায় করলোই না বরং কৃষকদের সচ্ছল করে তোলার জন্য খুলে দিল নন্দীসংকটের বন্ধ পথ। এই পথ দিয়ে শিবতরাইবাসী তাদের উৎপাদিত পশম বিক্রি করতে পারে বিদেশের বাজারে। রাজা রণজিৎ পথটি বন্ধ করে রেখেছিলেন যাতে এই পণ্য কেবল উত্তরকূটেই বিক্রি হয়। তাই নন্দীসংকটের পথ খুলে দেয়ায় এবং খাজনা সংগ্রহ না করায় রাজা রণজিৎ অভিজিৎকে শিবতরাই থেকে প্রত্যাহার করে তার স্থলে নিয়োগ করেন রাজশ্যালক চণ্ডপালকে। চণ্ডপালের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শিবতরাইবাসী ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে উত্তরকূটে এসে হাজির হয়। এ দিকে সম্প্রতি রাজা রণজিৎ শিবতরাইবাসীকে শায়েস্তা করার জন্য রাজ প্রকৌশলী বিভূতিকে দিয়ে মুক্তধারার স্রোত বন্ধ করে দেন। বাঁধটি অবাধ্য শিবতরাইবাসীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে উদ্যত। কিন্তু উত্তরকূটবাসী এতে উৎফুল্ল বোধ করে এবং বিভূতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। মর্মাহত যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইবাসীর বিপদের আশঙ্কায় বিভূতিকে বাঁধ ভেঙে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। ও দিকে উত্তরকূটবাসীরা অভিজিৎ কর্তৃক নন্দী সংকটের পথ খুলে দেয়ার সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মূলত তাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাজা অভিজিৎকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু রাজখুড়ো বিশ্বজিৎ কৌশলে অভিজিৎকে মুক্ত করে দেয়। এতে প্রজারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে অভিজিৎকে খুঁজতে থাকে। অভিজিৎকে বন্দী করার সংবাদে বিচলিত শিবতরাইবাসীরা যুবরাজকে তাদের রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। এ অবস্থায় সবাই শুনতে পেল বাঁধ ভেঙে মুক্তধারা প্রবাহের কলকল ধ্বনি। সংবাদ আসে যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইবাসীর দুঃখ নিবারণের জন্য বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। বাঁধের এক দুর্বল স্থানে অভিজিৎ আঘাত করলে পুরো বাঁধটি ভেঙে পড়ে। কিন্তু এর ফলে অভিজিৎও আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং মুক্তধারার তীব্র স্রোত আহত যুবরাজকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এ নাটক সম্পর্কে কবি কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে লেখেন :

> Machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে – কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে – তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্য সে প্রাণ দিয়েছে। [১১১]

কবির এ মন্তব্য অনুসরণ করে অনেক সমালোচক এ নাটকে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের চিত্র খুঁজেছেন। তাঁদের মতে, প্রাণকে আঘাত করছে যন্ত্র। সজীব গতিমান জীবনের প্রতীক মুক্তধারা। বাঁধটি জীবনের গতিরোধকারীর ভূমিকা নিয়েছে। বাঁধের কারণে জীবন হয়ে উঠল বিকৃত, সংকীর্ণ, ক্লেদাক্ত ও পীড়াদায়ক। অভিজিৎ অনুভব করলো যে, এ বন্ধন মোচন ছাড়া মুক্তির অন্য উপায় নেই। সে লক্ষ্যেই অভিজিতের আত্মবিসর্জন, আত্মমুক্তি।[১১২] সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যন্ত্রকে দেখেছেন পাশ্চাত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ হিসেবে ।[১১৩] অজিত কুমার ঘোষের মতে,

> মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতা এবং হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।... ... ... এই যান্ত্রিকতার আশ্রয় লইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্রমাগত শক্তি এবং সম্পদ লাভ করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিতেছে। [১১৪]

১১১.রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড (গ্রন্থ পরিচয় অংশ), কলকাতা, ১৩৯২, পৃ. ৫৩২-৫৩৩।

১১২. 'মুক্তধারার বদ্ধ জল বদ্ধ জীবন স্রোতের প্রতীক;নন্দীসংকটের রুদ্ধ পথ রুদ্ধ জীবনের প্রতীক; ... ... জীবনস্রোতে আর একবার স্বভাবের গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য অভিজিৎ জীবন ত্যাগ করিয়াছে। ' প্রমথনাথ বিশী , রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত , পৃ. ২৪৫।

১১৩.('পাশ্চাত্য জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বিপুল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-শক্তি বুদ্ধির শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি। এই যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই তাহারা বিজিত জাতিকে দমন করিতেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে, অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, জয় করিতেছে।' রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, পূর্বোক্ত , পৃ.২৯৪।

'এই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি হইতেছে যন্ত্রের সহিত প্রাণের, যান্ত্রিকতার সহিত আধ্যাত্মিকতার, বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের, দৈত্যের সহিত দেবতার, মানুষের পশু অংশের সহিত দেব- অংশের ।' ঐ , পৃ. ৩০৮)।

১১৪. অজিত কুমার ঘোষ , বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃ.৩৩৯, ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কবির বক্তব্য এবং সমালোচকদের মন্তব্য এড়িয়ে নাটকটির আখ্যান বিশ্লেষণে গেলে দেখা যায়, এখানে সরাসরি দুটো পক্ষ পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথম, উত্তরকূট-রাজা রণজিৎ , সাধারণ জনতা ও বিভূতি। দ্বিতীয়, শিবতরাইবাসী, ধনঞ্জয়, রাজকুমার অভিজিৎ, সঞ্জয়, খুড়ো রাজা, বটুক, অম্বা প্রমুখ চরিত্র। বিরোধের মূল কারণ, উত্তরকূটাধিপতি রণজিৎ কর্তৃক শিবতরাই থেকে কর আদায় করতে না পারা এবং তার ফলে উত্তরকূটের সচ্ছলতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়া। শিবতরাইবাসী কর দিচ্ছে না বলেই বাঁধ তৈরী করেছেন রণজিৎ। আবার যুবরাজ অভিজিৎ নন্দীসংকটের পথ উন্মুক্ত করায় উত্তরকূটের স্বার্থহানি ঘটেছে। এতে সহায়তা করার অপরাধে অভিজিৎকে প্রত্যাহার করে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে অত্যাচারী চণ্ডপালকে।

স্বাভাবিক ভাবে আশা করা যায় যে , শিবতরাইবাসী এ সব অন্যায় কাজের (কর দাবি , বাঁধ নির্মাণ এবং অভিজিৎকে প্রত্যাহার) প্রতিকারে এগিয়ে আসবে, সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু নাটকে শিবতরাইবাসীর অনুরূপ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করা যায় না। তারা উত্তরকূটে আসে প্রথমত রাজশ্যালক চণ্ডপালের অত্যাচার সম্পর্কে রাজাকে জানাতে এবং যুবরাজ অভিজিৎকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যেন রাজশ্যালক অত্যাচারী হলেও রাজা হবেন সুবিচারক এবং তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দেবেন। অথচ রাজা রণজিৎই বাঁধ নির্মাণ করিয়েছেন শিবতরাইবাসীকে জব্দ করার জন্য। নিম্নের উদ্ধৃতিতে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে :

ক) (শিবতরাই-এর একদল প্রজার প্রবেশ)

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে ?

১(প্রজা)। প্রভু রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না।

সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না , সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।[১১৫]

[নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের।]

খ) শি ৩। এ কী বিষণ যে। খবর কী?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে,

১১৫. মুক্তধারা , রবীন্দ্র রচনাবলী , ১৪শ খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি ?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে ?

সকলে। জোর করে । [১১৬]

[নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের।]

অর্থাৎ তারা যুবরাজের মত একজন সহানুভূতিশীল শাসক চায়। প্রয়োজনে জোর খাটাতেও তারা প্রস্তুত। পথিমধ্যে আচমকা রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাদের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজার কাছে খাজনা না দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে। নিম্নের সংলাপে আছে তার পরিচয় :

রণজিৎ। খাজনা দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেবো না।

রণজিৎ। দেবে না? এত বড় আস্পর্ধা ?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ। আমার নয় ?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার , ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।[১১৭]

কিন্তু রাজা ধনঞ্জয়কে বন্দী করে রাখলে প্রজারা নিরুপদ্রবে শূন্য হাতেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

---

১১৬. ঐ, পৃ.২১৪

১১৭. ঐ, পৃ. ২১৫। উদ্বৃত্ত অন্ন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস কথিত 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বের কথা এসে পড়ে। এখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী যে ভাবে উদ্বৃত্ত অন্ন রাজার বলে মত প্রকাশ করেছে তাতে পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের বিষয়টি ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য এটা লেখকের সচেতন চিন্তায় ঘটেছে কি না বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিবতরাইবাসীরা চলে যাওয়ার পর নাটক আবর্তিত হয় অভিজিৎকে কেন্দ্র করে। সে নন্দীসংকটের পথ খুলে দিয়েছে বলে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শাস্তি দাবী করে উত্তরকূটবাসীরা। বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষার জন্যই রাজা অভিজিৎকে বন্দী করে রাখতে বাধ্য হয়। অভিজিৎ সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং বাঁধ ভেঙে দিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

দেখা যাচ্ছে , নাটকের মূল দ্বন্দ্ব এক বিন্দুতে স্থির থাকে নি। নাট্যদ্বন্দ্বের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে বার বার। প্রথম, নির্মিত বাঁধটিকে কেন্দ্র করে শিবতরাইবাসীসহ উত্তরকূটেরও কয়েকজনের বিরুদ্ধতায় একটি দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়, উত্তেজিত শিবতরাইবাসীর সঙ্গে খাজনা বিষয়ে রাজা রণজিতের দ্বন্দ্ব। এবং তৃতীয়, অভিজিৎকে কেন্দ্র করে উত্তরকূট অধিবাসী ও রাজা রণজিতের দ্বন্দ্ব। সাধারণত একটি নাটকের কাহিনীতে একাধিক মূল দ্বন্দ্ব আকাঙ্ক্ষিত নাট্য অভিঘাত সৃষ্টিতে সহায়তা করে না। [১১৮] এখানে স্বার্থের ভিত্তিতে দুটো পক্ষ স্পষ্ট হলেও একক কোন দ্বন্দ্ব প্রধানভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। কর না দেয়ার অপরাধে শিবতরাইবাসীদের জব্দ করার জন্য কাহিনীর সূচনায় যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে – অভিজিৎকে প্রত্যাহার, চণ্ডপালের নিয়োগ ও বাঁধ নির্মাণ –তার বিরুদ্ধে শিবতরাইবাসীদের সংগ্রামের ফলে যদি বাঁধ ভাঙার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতো , তা হলে কাহিনীটি একটি বাস্তবভিত্তিক সম্পূর্ণতা পেতে পারতো। কারণ, অত্যাচারিত , নিপীড়িত মানুষের মধ্যে এর প্রতিকার স্পৃহা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে, তাদের সংগ্রাম পরিণত হতো বিদ্রোহে, বিপ্লবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পথে অগ্রসর না হওয়ায় নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব নগ্ন বাস্তবানুগ হতে পারে নি। হয়তো ধারণা করা হয়েছে যে, সে পথ যেহেতু হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার , রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার সম্মিলিত সংগ্রাম, সেহেতু ঐ পথে ঘটবে রক্তাক্ত পরিণতি। এবং তার ফলে প্রজা কর্তৃক রাজপুরুষের অবমাননা, এমন কি হত্যার মতো পরিস্থিতির উদ্ভবও ঘটতে পারে। আর সেখানেই কবির মন সায় দিতে প্রস্তুত নয়। প্রতিবাদী জনতার হিংসাত্মক প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড তিনি সমর্থন করতে

---

১১৮. সাধন কুমার ভট্টাচার্য , নাট্যতত্ত্ব সীমাংসা, কলকাতা, ১৯৯৪ , পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পারেন নি। [১১৯] তিনি মারকে মার না-লাগার অনুভূতি দিয়ে জয় করতে চান, না-মারা দিয়ে ঠেকাতে চান। তিনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে চান আত্মার শক্তিতে। অথচ যৌক্তিক সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী হলে শিবতরাইবাসীদের সুষ্ঠু জীবনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হতে পারতো। তারা অনাবশ্যক করভারে জর্জরিত হতো না, কৃষিকাজ ও খাওয়ার জল সমস্যার সম্মুখীন হতো না কিংবা উৎপাদিত পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রির ক্ষতিও তাদের স্বীকার করতে হতো না।

সমসাময়িক ভারতের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও নাটকের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সহায়ক হতে পারতো। কারণ, এ সময় সারা ভারতে এক দিকে যেমন শিল্পশ্রমিক এবং রেল ও স্টিমার কর্মীদের ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন প্রান্তে চলছিল কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত 'কর বন্ধ' আন্দোলন। [১২০] এ সব ধর্মঘট ও আন্দোলন ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশি জমিদার এমন কি গান্ধী ও কংগ্রেসকেও বিব্রত করে তুলেছিল। উক্ত পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী থেকে সমান্তরাল ধারার নাটক আন্দোলনকারীদের মনোবল নিঃসন্দেহে দৃঢ় করে তুলতো। কিন্তু কবি জনগণের সংগ্রাম তথা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি বলে আন্দোলনের সঙ্গে যেমন একাত্ম হন নি, তেমনি নাট্যকাহিনীতেও তার প্রশ্রয় দেন নি।

---

১১৯. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

'রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু যে শক্তি সংহত ছিল শিবতরাই-এর মানুষের মধ্যে, বৃদ্ধ বটুর মধ্যে, সমস্ত নিপীড়িত সর্বহারাদের মধ্যে , তার আগ্নেয় বিস্ফোরণ দেখান নি। এমন কি পীড়িত শক্তি যাকে নেতা বলে স্বীকার করেছিল সেই ধনঞ্জয়ও সকলের ক্ষোভকে সংগঠিত বিরুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন নি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ-নির্ভর মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে তার ঐক্য ছিল না বলে। ' সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৮৯ , পৃ.৩৬।

১২০. সুমিত সরকার , পূর্বোক্ত , পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এক অনির্দেশ্য রহস্যময়তার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যা থেকে কোন সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার উপায় থাকে না।[১২১]

বস্তুত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর সদস্যের পক্ষে, বাস্তব জীবনের মতো, শিল্প সাহিত্যের কাহিনীতেও কৃষকদের বিদ্রোহ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই মানসিকতা যে শ্রেণী-স্বার্থের রাজনীতি-উদ্ভূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মধ্যেও। সে কৃষক নেতা হয়েও এদেশের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ কোন সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসারী নয়। সে হয়ে উঠেছে গান্ধীর মতো ভগবান-আশ্রয়ী, অহিংসবাদী আধ্যাত্মিক নেতা। লক্ষণীয় যে, শিবতরাইবাসীরা তাকে 'প্রভু' হিসেবে সম্বোধন করে। তাই চরিত্রটি মনে হয় একান্তভাবে আইডিয়া উদ্ভূত ও অবাস্তব। অবশ্য ধনঞ্জয়ের অহিংসবাদ আবার হুবহু গান্ধীর সত্যাগ্রহের মতো নয়। বরং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্পর্কে যা ভাবতেন তা-ই তুলে ধরা হয়েছে এর মাধ্যমে। তাঁর মতে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন সবার জন্য নয়, কয়েক জন দৃঢ়চেতা বীরের পক্ষেই কেবল তা সম্ভব।[১২২] তাই এখানেও অত্যাচারের মুখে কৃষকদের নির্বিকার থাকার উপদেশ দেয় ধনঞ্জয় :

ক) ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলিনে ? আজও লাগে ?

২(প্রজা)। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার ! বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরের যে ঠাকুরটি আছেন

---

১২১. **KRISHNA KRIPALANI** তাঁর RabindranathTagore : A Biography গ্রন্থে 'মুক্তধারা'র রহস্যময় সমাপ্তির সঙ্গে ইবসেনের শেষ পর্যায়ের নাটকগুলোর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন:

> The socio-political motif of the play if such there is , seems to dissolve at the end in an undefined sense of mystic selffulfilment, as in some of Ibsen's later plays'. **VISVA-BHARATI, 1980** , p.311

১২২. ১০৬ নং সূত্র দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।[১২৩]

খ) গনেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ঐ ষণ্ডামার্কা চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে ? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।[১২৪]

এ রকম আধ্যাত্মিক নেতার পক্ষে সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায় অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। এক পর্যায়ে শিবতরাইবাসীর মানস-প্রবণতা সম্পর্কে রাজা রণজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ রীতিমতো প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। যেমন :

ক) রণজিৎ। কী বৈরাগী , চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি ; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে ?

ধনঞ্জয়। ওদের যতটা মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকী, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

... ...

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য ?

১২৩. মুক্তধারা , রবীন্দ্র রচনাবলী , পূর্বোক্ত , পৃ. ২০৭।

১২৪. ঐ , পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনে বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন ? সরো-না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।[১২৫]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, রাজা রণজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সম্পর্কটি অন্তত বিরোধের নয়। আর এটি সম্ভব হয় কৃষকদের প্রতি অত্যাচার এবং তাদের দাবিকে বস্তুগত দৃষ্টিতে না দেখে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণে বিচার করলে। এ দিক থেকে নিঃসন্দেহে সে একজন যথার্থ অহিংসবাদী নেতা। ধনঞ্জয়ের সংলাপের এক অংশে – 'যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি' – আত্মসমালোচনার যে সুর লক্ষ্য করা যায় তা তৎকালীন সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশে রচিত বলে অনুমান করা যায়। কারণ, গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত জনতা সত্যিকারের সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠে নি – এটি গান্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লক্ষ্য করেছিলেন। এ কারণে সেই সময়ও 'মুক্তধারা' নাটককে অসহযোগ আন্দোলনকেন্দ্রিক নাটক বলে মন্তব্য করা হয়েছিল।[১২৬] কিন্তু 'পাকিয়ে তুলতে' না পারার ব্যর্থতায় ধনঞ্জয়ের মতো ভারতের অহিংসবাদী নেতা গান্ধী শ্রমিক কৃষকের বৈপ্লবিক উত্থান দেখে সাফল্যের কাছাকাছি গিয়েও স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন আন্দোলন।[১২৭]

---

১২৫. ঐ , পৃ.২১৮।

১২৬. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী , রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ (সমকালীন প্রতিক্রিয়া) , পূর্বোক্ত , পৃ. ১৭৮।

১২৭. বোম্বের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লয়েড এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

Gandhi's was the most colossal experiment in world history; and it came within an inch of succeeding . But he couldn't control men's passions. They became violent and he called off his programme. Quoted . **R. PALME DUTT, INDIA TODAY.** Ibid, p.351 ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই গণমুখী আন্দোলন-বিমুখ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তা ছাড়া অপর একটি সংলাপে জমিদার রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিসহ উপস্থিত। রাজা রণজিৎকে ধনঞ্জয় বলে , 'আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার , ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।' –রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে , উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কৃষক যে ফসল উৎপাদন করে তার একটি অংশ রাজা কেন ভোগ করবে, এ বিষয়ে বৈরাগীর মনে কোন প্রশ্ন নেই। জমিদারকে জমির 'প্যারাসাইট', 'পরাশ্রিত জীব' বলেও চাষীর উৎপাদনে রাজার (জমিদারের) স্বত্ব বৈরাগী বা জমিদার রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারছেন না।[১২৮] সোভিয়েত সাহিত্য সমালোচক লুনাচারস্কি বলেছিলেন :

> একটি শিল্পকর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণী মনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে। [১২৯]

বৈরাগীর সংলাপে এই মনস্তত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতি না করলেও , রাজনৈতিক নাটক না লিখতে চাইলেও রাজনীতিকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। বরং সঠিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবকল্যাণ বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য শিল্প সাহিত্যে প্রচারিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। [১৩০] তাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করে আন্তর্জাতিকতা আশ্রয় করে যে কবি বিশ্বের মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন আজীবন, তিনিই সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে শ্রেণী সংকীর্ণতার প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক ও সামজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। এ নাটকের অন্যতম

---

১২৮. 'আমি জানি জমিদার জমির জোঁক ; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রায়তের কথা' , রবীন্দ্র রচনাবলী , ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী ,১৩৯৩ , পৃ. ৪২৭।

১২৯. উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা,ঢাকা, ১৯৮৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

১৩০. ১২৮ নং সূত্র দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

এন্টাগোনিস্ট উপাদান একটি যন্ত্র (Machine) । এই যন্ত্রকেই অভিজিৎ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরাজিত করেছে। কারণ,যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্র দিয়ে ভাঙলে প্রকারান্তরে যন্ত্রেরই জয় ঘটে ; কিংবা মানুষের অধিকতর পরাজয় ঘটে।[১৩১] নাটকে এই যন্ত্র তথা বাঁধটিও এক অপশক্তি হিসেবে প্রতীকায়িত। যন্ত্রটি শিবতরাইবাসীকে জব্দ করার জন্য নির্মিত হলেও কয়েক জন উত্তরকূটবাসীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর ফলে। অম্বার সন্তান, বটুকের নাতিসহ আরও অনেকের জীবন বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে বিনষ্ট হয়েছে। আবার নির্মিত বাঁধের বীভৎস আকৃতিও রাজা রণজিৎসহ অনেককেই করে তোলে ভীত। যেমন :

ক) বিভূতি। ... ... দেখো উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। [১৩২]

খ) রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কি আকাশে ?

মন্ত্রী। মহারাজ ভুলে যাচ্ছেন, এটাইতো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়ো । ... ...

রণজিৎ। দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন ? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে। [১৩৩]

এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপেও এই যন্ত্রের ভয়ানক আকৃতির বর্ণনা রয়েছে। যেমন :

ক) পথিক। বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। [১৩৪]

---

১৩১. প্রমথনাথ বিশী , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।

১৩২. মুক্তধারা , পূর্বোক্ত , পৃ. ১৯০।

১৩৩. ঐ , পৃ. ১৯৯।

১৩৪. ঐ পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

খ) উত্তরকূট ১। ... ... ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে ।

কুন্দন। ... ... উত্তরকূটের যে দিকে ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।[১৩৫]

একটি যন্ত্রের প্রতি নাট্যকারের এই মনোভঙ্গি আধুনিক মানুষের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যন্ত্র বহু ক্ষেত্রে মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করে অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। সর্বোপরি যন্ত্রের যথাযোগ্য প্রয়োগেই বর্তমানের এই বিশাল সভ্যতার সৃষ্টি । তাই আধুনিক মানুষের পক্ষে যন্ত্রের সাহায্য না নেয়ার বিষয় অবান্তর বলে প্রতীয়মান হয়। তা ছাড়া, যে যন্ত্রের নিজস্ব কোন সত্তাই নেই তার বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যা হতে পারে যন্ত্র-সংগঠন ব্যবস্থার মধ্যে।[১৩৬] যন্ত্র সর্বমানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সেটাই মূল কথা। অথচ, অভিজিৎ বা মুক্তধারা নাটক সেই সংগঠন ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে না। বিজ্ঞান বা যন্ত্র সভ্যতার বিপুল সুবিধাসমূহ সারা পৃথিবীতে একটি শ্রেণী ভোগ করছে নানা কৌশলে। সেই সঙ্গে অপর এক বিশাল শ্রেণীকে তারা নিপীড়ন ও শোষণ করছে। সে ব্যবস্থায় আঘাত করতে এ নাটক অসমর্থ। অরবিন্দ পোদ্দার তাই মন্তব্য করেছেন :

---

১৩৫. ঐ , পৃ. ২২৭।

১৩৬.অবশ্য পরবর্তী সময় যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতার প্রতি কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৩০ সালে শেষবারের মত আমেরিকায় গেলে সেখানকার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন:

> We have nothing to blame machinary for in itself. It is men who are greedy and make use of the truths of science in order to exploit each other for their own selfish puspose' [The Boston Herald : 14th October, 1930] , উদ্ধৃত : নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৩য় খণ্ড, কলকাতা , ১৯৯১ , পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

> যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতার আন্তরবেদনার ও সংঘাতের যে নাট্যরূপ 'মুক্তধারা'য় দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব সামাজিক সংঘাত ও বেদনার প্রকৃত কোন মিল অথবা সঙ্গতি নেই।[১৩৭]

একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন নীহাররঞ্জন রায় :

> যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে যুবরাজ অভিজিতের যে দ্বন্দ্ব তাহা সমাজ চৈতন্যের সজ্ঞান পরিচয় নয়, অভিজিৎ যন্ত্রটাকে আঘাত করিয়া ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যাহারা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে দাস করিয়াছে তাহাদের আঘাত করেন নাই।[১৩৮]

মুনীর চৌধুরীর মতে, 'সমকালীন পাঠক দর্শক শ্রোতা হয়ত মুক্তধারায় মন্ত্রীর গানের চেয়ে যন্ত্রীর গানেই বেশি মুগ্ধ হবে'। [১৩৯]

এ কালের কয়েক জন মার্কসবাদী সমালোচক 'মুক্তধারা' নাটক আলোচনা করতে গিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ও চকিত মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মতে, উত্তরকূটের রাজা এবং তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী প্রজাদের মধ্যে ব্রিটিশের প্রচ্ছায়া আছে। আর শিবতরাই হলো পরাধীন ভারতবর্ষ। যন্ত্ররাজ বিভূতিকে তুলনা করা হয়েছে এ যুগের টেকনোক্র্যাটদের সঙ্গে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে তৎকালীন অহিংস প্রতিরোধ এবং অভিজিতের জীবনদানে তৎকালীন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগের নিদর্শন খুঁজেছেন তারা। [১৪০]

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করেছি, যেখানে তিনি বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড 'কাপুরুষোচিত' এবং 'সমর্থনযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। আর অভিজিৎ এখানে নিপীড়িত পক্ষের হয়ে আত্মবিসর্জন দিলেও কবির মতে সে 'মারনেওয়ালাদের' ভেতরের মানুষ অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষের। তাই এই সমীকরণটি যুৎসই নয়। বিভূতিকে কেউ কেউ 'টেকনোক্র্যাট' বলেছেন। এটিও যে আধুনিক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা ইতোমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

তবে উত্তরকূট শিবতরাই সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ সম্পর্ক

---

১৩৭. অরবিন্দ পোদ্দার , রবীন্দ্র-মানস ,কলকাতা, ১৯৬৯ ,পৃ. ৬৪।

১৩৮. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৬৯ ,পৃ.৩৩০।

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ (সম্পা. আনিসুজ্জামান), ঢাকা, ১৯৬৮ , পৃ. ৩২৪।

১৪০. সুধী প্রধান, 'রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক' , পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীকায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। সেই সঙ্গে নাকচ করা যায় না অহিংসবাদী গান্ধীর সমান্তরাল হিসেবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথাও। বস্তুত, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ স্মরণ করলে এই তুলনা খুবই স্বাভাবিক। বরং ধারণা করা যেতে পারে, কবি এটি সচেতন ভাবেই করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন , বিশেষ করে সত্যাগ্রহীদের। বোধ করি এ জন্যেই রচিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই নাটকটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় এবং কবির নিজের অনুবাদে ইংরেজিতে 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [১৪১] এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি পত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে এ নাটকের প্রকাশ কবির বিশেষ উৎসাহেই ঘটেছিল বলে অনুমান করা চলে। নাটকের বক্তব্য খুব দ্রুত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গোচরীভূত হোক–এটাই যেন তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সমাধান নাটকে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক ছিল না।

প্রকৃত পক্ষে, শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম না হলে, কৃষক শ্রমিকের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যও শিল্পকর্মে ধারণ করা সম্ভব হয় না। যদি তা হতো ,তা হলে এ দেশের বহু কৃষক-সংগ্রাম ও সেই সময়ের ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারতেন; এবং নাটকেও প্রকাশ করতে পারতেন সেই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যৌক্তিক সমাধান। সে ক্ষেত্রে , তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে নাটকটি ব্যাপক প্রভাব ফেলতেও সক্ষম হতো। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, সে সময় বিদ্রোহী কৃষকরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করার মাধ্যম হিসেবে গ্রামীণ নাটক, গান ও চারণ কবিদের আবৃত্তিও ব্যবহার করেছিল। [১৪২] 'মুক্তধারা ' নাটকেও সে সুযোগ ছিল ; কিন্তু নাট্যকারের বস্তুবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা আর হয়ে ওঠে নি। বস্তুত, শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সে সময়ের জমিদার, মধ্যশ্রেণী বা পাতি বুর্জোয়া নেতৃত্বের

১৪১. The English writings of Rabindranath Tagore, Vol . Two, Ed. Sisir kumar Das, Shahitya Akademy 1996, p.165. ' The Waterfalls', Modern Review , May 1922 (Notes . p.767)।

১৪২. ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৬ ,পৃ. ৫৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষেও শ্রমিক-কৃষকের মিলিত শক্তিকে সঠিক পথে তথা সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের লেজুড় বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করা নানা কারণে সম্ভব হয় নি। এ কারণে বিষয় ও তার পরিণতি বিবেচনায় 'মুক্তধারা' নাটকের ব্যর্থতা একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, ঐতিহাসিক একটি সময়েরই ব্যর্থতা বলে স্বীকার করতে হয়।

রক্তকরবী :'মুক্তধারা '(১৯২২) রচনার পর প্রায় এক বছর পাঁচ মাস কবি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। এ সময় রচিত কিছু গান এক সঙ্গে গুছিয়ে তাতে সংলাপ যোগ করে গড়ে তোলেন 'বসন্ত' (১৯২৩) নামের একটি নাটিকা। এটি উৎসর্গ করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে কাজী নজরুল ইসলাম তখন আলিপুর জেলে বন্দী। বইটি সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। [১৪৩] কিছু দিন পর (১৯২৩) গ্রীষ্মের ছুটিতে বরীন্দ্রনাথ বেড়াতে যান শিলঙ পাহাড়ে। সেখানে লেখা হয় 'যক্ষপুরী' নামে একটি নাটক। পরে তা-ই 'রক্তকরবী' নামে 'প্রবাসী ' পত্রিকায় (আশ্বিন,১৩৩১ সংখ্যা) এবং গ্রন্থাকারে (ডিসেম্বর , ১৯২৬) প্রকাশিত হয়। [১৪৪]

'রক্তকরবী' রচনার কিছু কাল আগে (১৯২২ সালের প্রথম দিকে) ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস সেবাদল এবং খিলাফৎ কমিটি বে-আইনী ঘোষণা করলে বহু নেতা গ্রেপ্তার হন। এমন কি সাধারণ মানুষও গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে সেবাদল সংগঠনে নাম লিখিয়ে। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে গান্ধী শুরু করেন গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন। কিন্তু এক পর্যায়ে (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) যুক্তপ্রদেশের ক্ষুব্ধ কৃষকরা চৌরিচৌরায় থানা আক্রমণ করে বাইশ জন পুলিশকে পুড়িয়ে হত্যা করলে গান্ধী ঐ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। [১৪৫] সঙ্গত কারণেই এ সিদ্ধান্তে কারাগারে অন্তরীণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দসহ সারা ভারতের নেতৃত্ব ব্যক্ত করেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। [১৪৬] গান্ধী নিজেও গ্রেপ্তার হন মার্চ মাসে (১৯২২)। এ ভাবে

---

১৪৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্রজীবনকথা, পূর্বোক্ত ,পৃ.১২১।

১৪৪. রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১১৫।

১৪৫. R. PALME DUTT , INDIA TODAY. Ibid , p.349।

১৪৬.সরল চট্টোপাধ্যায় ,ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০ , পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্যায়ের অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। এ রকম পরিস্থিতিতে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটক যা রূপক-সাংকেতিক ধারায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

এর কাহিনীতে আছে : যক্ষপুরী এক পাতাল রাজ্য। এখানে সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে রাজা । সেই সোনা তোলার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে শ্রমিক এনে ভয়ংকর পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে দালাল শ্রেণী : মোড়ল ও সর্দাররা। শ্রম ছাড়া শ্রমিকদের কোন মানবিক মূল্য নেই। তাই তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় নম্বর দিয়ে। কাজে, কথায় কিংবা আচরণে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলেই শ্রমিকদের ওপর নেমে আসে অত্যাচার। ফলে বিভিন্ন সময় নানা অঘটনে শ্রমিকের মৃত্যু এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। এদের মধ্যে যাতে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়, সে উদ্দেশ্যে দালাল গোঁসাইও নিয়োজিত আছে। সে নামাবলি পরে শ্রমিকদের কানে ধর্মের ললিত বাণী শোনায় রাজার শোষণ শাসন অব্যাহত রাখার স্বার্থে। যক্ষপুরীর রাজার জীবন প্রণালীও বেশ রহস্যজনক। জালের আড়ালে তার বসবাস। বিশেষ দিন ছাড়া রাজা বাইরে আসে না। এই যক্ষপুরীতে নন্দিনী নামে এক নারীর আগমন ঘটে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা নন্দিনীকে দেখে যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মনে ঘটে নতুন ভাবের জাগরণ। শ্রমিক কিশোর তার কাজের ফাঁকে নন্দিনীর জন্য রক্তকরবীর গুচ্ছ এনে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। পণ্ডিত অধ্যাপক নন্দিনীর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আনন্দ পান। শ্রমিক বিশু পাগলের সঙ্গেও ভাব হয়ে যায় নন্দিনীর। এমন কি সর্দারদের মধ্যেও নন্দিনীকে নিয়ে আলোড়ন জাগে।

নন্দিনী সবাইকে বুঝতে পারলেও রাজার রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। রাজা তার সঙ্গে বহু কথা বলে, কিন্তু তাকে জালের সীমা অতিক্রম করতে দেয় না। নন্দিনী রাজাকে জালের বাইরে এসে পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং ফসল কাটার আনন্দ উপভোগের আহ্বান জানায়। রাজা নন্দিনীকে পছন্দ করলেও এই আহ্বানে সাড়া দেয় না । বরং রাজা নিজের অমিত শক্তির জোরে তাকে অধিকার করতে চায়। কিন্তু নন্দিনীর সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে আছে তার সঙ্গী রঞ্জন। নন্দিনী তারই প্রতীক্ষা করে। সর্দারদের কথায় জানা যায় রঞ্জন মানুষ হলেও সে যেন যাদু জানে। তাকে কিছুতেই বাধ্য করানো যায় না। সে

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের নিয়ে নানারকম সৃষ্টিছাড়া কাজে মেতে ওঠে। কখনও খোদাইকরদের নিয়ে করে খোদাই নৃত্য, কখনো কোদাল চালিয়ে ধরে গান। তাকে কোথাও আটকে রাখাও যায় না। সর্দাররা সিদ্ধান্ত নেয় তারা কিছুতেই রঞ্জন ও নন্দিনীর মিলন ঘটতে দেবে না। কারণ তা হলে যক্ষপুরীর সমস্ত প্রশাসন পড়বে ভেঙে। তারা বিশু পাগলকে বন্দী করে রাখে যাতে সে রঞ্জনের কোন সংবাদ নন্দিনীকে দিতে না পারে। ও দিকে তারা রঞ্জনকে পাঠিয়ে দেয় রাজার কাছে। দানবীয় শক্তিধর রাজা বিদ্রোহীদের নিজে শাস্তি দেয় কখনও কখনও হত্যা করে। রাজা রঞ্জনকে চিনতে না পেরে তাকে হত্যা করে বসে। এমন সময় রাজার কাছে এসে নন্দিনী দরজা খুলে দিতে বলে । রাজা দরজা খুলতেই মৃত রঞ্জনকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে নন্দিনী। রাজা রঞ্জনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয় এবং বলে, সর্দাররা তাকে ঠকিয়েছে। রাজা নির্দেশ দেয় সর্দারদের বন্দী করতে। নন্দিনী বলে, এবার রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হলো । রাজাও এই লড়াইয়ে (নিজের বিরুদ্ধে) যোগ দেয়ার ইচ্ছায় ধ্বজা পূজার সরঞ্জাম ভেঙে ফেলে বেরিয়ে পড়ে নন্দিনীর সঙ্গে।

ও দিকে শ্রমিকরা বন্দীশালা ভেঙে দলে দলে বেরিয়ে সর্দার ও সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। নন্দিনী ছুটে যায় যুদ্ধের মধ্যে। রাজা, অধ্যাপক, বিশু, ফাগুলাল সবাই 'নন্দিনীর জয়' বলে অগ্রসর হয়। দূরে শোনা যায় ফসল কাটার গান।

কবি নিজে এ নাটকের ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনও বলেছেন 'নাটকটি সত্যমূলক', 'রূপকনাট্য নয়', [১৪৭] আবার কখনও নিজেই এর রূপকত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হয়েছেন। [১৪৮] এর মধ্যে 'যাত্রী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে :

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে

---

১৪৭. রক্তকরবী (নাট্য পরিচয় অংশ), পূর্বোক্ত ।

১৪৮.RED OLENDERS : AUHOR'S INTERPRETATION, রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত ,পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত । সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে , প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এ নাটকে তাই বর্ণিত আছে। [১৪৯]

'রাজা' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকসমূহে বিভিন্ন কাহিনীর অন্ত র্লীন প্রবণতা হলো – অবরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি। এ নাটকেও তা সমান লক্ষণীয়।

যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ বিপুল শক্তি-সংগঠন (কবি যাকে যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) দ্বারা মাটির নীচ থেকে স্বর্ণ আহরণে ব্যস্ত। তার দুর্দমনীয় লোভের জাঁতাকলে এক দিকে বহু শ্রমিকের প্রাণ পিষ্ট হচ্ছে , অপর দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য সম্ভোগ এবং মনুষ্যত্বহীনতা (রাজার) অন্তরতম সত্তাকে বিকৃত করছে। জালের আবরণ সেই বন্ধ, আনন্দহীন, প্রেমহীন আত্মার প্রতীক। তার ভেতরের দেব অংশ আজ অবরুদ্ধ। সে এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে উৎসুক। সৌন্দর্য ও আনন্দের লীলাচঞ্চলতার প্রতীক নন্দিনীর কাছে তার করুণ আর্তি :

আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি - তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি -আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা

১৪৯.'যাত্রী' , রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত ,পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। [১৫০]

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাবই হয়েছে রাজার অন্তরাত্মার মুক্তির প্রয়োজনে। কোন কাজে সে নিয়োজিত নয়, সে নাট্যকারের আইডিয়ার বাহনমাত্র। [১৫১] সে রাজার দরজায় আঘাত করে বলে, 'আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই'। [১৫২]

আবার কখনও রাজাকে সে আহ্বান করে, 'আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।' [১৫৩] কিন্তু বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত রাজা জড়ত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। মুক্তিপিপাসা ও অভ্যস্ততার বন্ধনে সৃষ্টি হয় সংঘাত। নন্দিনীকে রাজা বলে :

> আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাইনে। যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন আসবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি। [১৫৪]

এক সময় রাজা বুঝতে পারে, তার এই আনন্দহীন প্রতিষ্ঠাকে বেঁচে থাকা বলে না , বলে টিকে থাকা। বাঁচতে হবে প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণের মধ্য দিয়ে। একটি দৃশ্যে এর ইঙ্গিত আছে :

নন্দিনী

– মাগো . তোমার হাতে ওটা কী ?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী

কী করবে ওকে নিয়ে ?

---

১৫০. রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী , ১৫শ খণ্ড, বিশ্বভারতী ,১৩৯৩ ,পৃ. ৩৫৩-৩৫৪।

১৫১. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪৮।

১৫২. রক্তকরবী, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৩৫০।

১৫৩. ঐ , পৃ. ৩৫২।

১৫৪. ঐ , পৃ. ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকে ছিল। তার-ই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এই ভাবে কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানেনা। আজ আর ভালো লাগলনা ; পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয় ? [১৫৫]

এ রকম মুক্তি রাজার জীবনেও ঘনিয়ে এসেছে। তার ভেতরের নেতি-অংশের মৃত্যুর পর তারও মুক্তি হবে। কিন্তু তা সহজে হবার নয়। প্রতাপের অংশ চায় নন্দিনীকে এবং তার প্রেমের প্রতীক রক্তকরবীগুচ্ছ কেড়ে নিতে। আবার কখনও নন্দিনীর সহজ প্রাণের লীলার আহ্বান তার মুক্ত প্রাণের উদ্বোধন ঘটিয়ে দিতে চায়। রাজা বলে :

ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয় , ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি ; আবার ভাবছি নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয় তা হলে–

নন্দিনী

তা হলে কী হবে?

নেপথ্যে

তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব। [১৫৬]

রাজার সেই মৃত্যুর সময় আসে ধ্বজা পূজার দিন। রাজা ধ্বজা পূজার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে দিন বিশু পাগলকে বন্দী করা হলে তার প্রতিবাদে কারিগররা বিদ্রোহ করে। নন্দিনীও রাজার কাছে এর কৈফিয়ৎ চাইতে এসে দেখে মৃত রঞ্জনকে । রাজা-ই রঞ্জনকে খুন করেছে। তখন শুরু হয় রাজার বিরুদ্ধে নন্দিনীর লড়াই। বলা বাহুল্য , এ লড়াই কিছুতেই বাস্তব লড়াই নয়,আত্মিক লড়াই । নন্দিনীর প্রাণ-প্রাচুর্য দিয়ে রাজার অভ্যন্তরস্থ দেবশক্তিকে জাগাবার লড়াই। সে লড়াইয়ে নন্দিনীর হাত থাকে রাজারই হাতে। রাজা বলে :

---

১৫৫. ঐ, পৃ. ৩৭১।

১৫৬. ঐ, পৃ. ৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক – তাতেই আমার মুক্তি। [১৫৭]

কারণ, রাজার আত্মার দেব-অংশের জয় ঘটলেই তার প্রাণ-প্রবাহ মুক্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের ব্যাখ্যা হলো, 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ ; সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।' [১৫৮] নাটকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হলো ফাগুলাল অধ্যাপকের সংলাপে :

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক?

অধ্যাপক

কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে – পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম। [১৫৯]

এ ভাবে রক্তকরবীর রাজা নন্দিনীর আহ্বানে তার মুক্ত স্বরূপকে খুঁজে পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য রূপক-সাংকেতিক নাটকের মতো এ নাটকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই বললে চলে। তবে এই মুক্তিতত্ত্বের কাহিনী যে প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে রাজনীতির উপস্থিতি সহজেই লক্ষণীয়। এবং তা বিস্ময়করভাবে প্রায় বস্তুবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরাল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কোন কালেই মার্কসবাদী ছিলেন না এবং সমাজতন্ত্রীরাও তাঁর কাছ থেকে খুব একটা মর্যাদা কিংবা সহানুভূতি লাভ করতে পারেন নি।[১৬০] অথচ এ নাটকে যক্ষপুরীর যে সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তাতে পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণই মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন এক. মার্কসবাদীদের মতে সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করলেও এই শ্রেণীর প্রধান ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানা ও সীমাহীন শ্রমশোষণ। এই শ্রেণীর কাছে সমাজের যাবতীয় কিছু মূল্যায়িত হয় অর্থের বিনিময়ে । মানুষের যে সব

---

১৫৭. ঐ , পৃ. ৩৯৭।

১৫৮. রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ) , পূর্বোক্ত , পৃ. ১১৬।

১৫৯. রবীন্দ্র রচনাবলী , পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৯৯।

১৬০. 'রায়তের কথা', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি , বিজ্ঞানী সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরীভোগী শ্রমজীবীরূপে।[১৬১]

'রক্তকরবী'র শ্রমিক, কারিগর, সর্দার, গোঁসাই, অধ্যাপক, পুরাণবাগীশ সবাই মকররাজ-এর মজুরীভোগী। এর মধ্যে শ্রমিক-কারিগরদের পরিশ্রম সবার চেয়ে বেশি। কখনও কখনও তা আক্ষরিক ভাবেই পাশবিক হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মোড়লের সংলাপ :

> পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেয়া যাবে।[১৬২]

দুই. বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই সৃষ্টি করে এক শ্রমিক শ্রেণী । এই শ্রেণীটিকে বুর্জোয়ারা ততক্ষণই বাঁচিয়ে রাখে যতক্ষণ তারা কাজ করতে পারে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য বা পুঁজি বাড়াতে পারে। তাই নিজেদেরকে শ্রমিকরা বুর্জোয়ার কাছে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। [১৬৩]

এখানেও দেখা যায় ফাগুলাল, বিশু, গোকুল, অনূপ, শকলু প্রমুখ শ্রমিক তাদের প্রাণ নিংড়ে স্বর্ণ আহরণ করেই চলেছে। কিন্তু এ পরিশ্রম তাদের জন্য ইতিবাচক কোন ফল সৃষ্টি করছে না। যেমন, বিশু বলে :

> সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি – এক হাতের পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি –এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোন অর্থে পৌঁছয় না ।[১৬৪]

সোনা তোলার জন্যই কেবল তাদের বেঁচে থাকা। তাতে অপারগ হয়ে গেলে তারা নিক্ষিপ্ত হয় রাজার এঁটো হিসেবে। নন্দিনী এই এঁটোদের দেখে আঁৎকে ওঠে :

---

১৬১. মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মস্কো, ১৯৭০ ,পৃ.৩৫ ।

১৬২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৩৮৯।

১৬৩. মার্কস-এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৯।

১৬৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৬০ ।

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে দেখো , ও কী ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরির দরজা খুলে গেছে নাকি ! ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে – ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে ?

সর্দার। ওদের আমরা বলি 'রাজার এঁটো'।

নন্দিনী। মানে কী ?

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ সব কী চেহারা ! ওরা কি মানুষ ! ওদের মধ্যে মাংস মজ্জা মন প্রাণ কিছু কি আছে ?

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনদিন ছিল ?

সর্দার। হয়তো ছিল। [১৬৫]

তিন. বুর্জোয়ারা তাদের বিশাল শিল্প-কারখানায় বিপুল পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করে। তাদের সংগঠিত করা হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্প-বাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসেবে তারা থাকে কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের এক বহুধাপী ব্যবস্থার অধীন । [১৬৬]

তেমনি, যক্ষপুরিতে রয়েছে নিপুণ শ্রমবিভাগ । রয়েছে করাতী, খোদাইকর, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী। তাদের আবাসস্থল ট, ঠ , ঞ, দন্ত্য-ন, মূর্ধন্য-ণ পাড়া প্রভৃতি। আর এদের ওপর খবরদারি করার জন্য আছে ছোট সর্দার, মেঝো সর্দার এবং মোড়লরা।

চার. ব্যক্তিমালিকানা এবং শ্রম শোষণের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা (Alienation)। বিচ্ছিন্নতা চার ধরনের হতে পারে। যেমন :

ক) উৎপাদিত দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্নতা ;

খ) উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা ;

গ) প্রজাতি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ; এবং

---

১৬৫. ঐ , পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

১৬৬. মার্কস-এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত , পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা। [১৬৭]

ক) আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিকের মতো যক্ষপুরীর শ্রমিকরাও তাদের উত্তোলিত স্বর্ণের মালিক নয়। তাই সে স্বর্ণ আহরণে তাদের আগ্রহ কিংবা আনন্দ কোনোটাই নেই। 'দুই' অনুচ্ছেদ-এর বিশুর সংলাপেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে তাদের কাজে উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই। [১৬৮] আর এ জন্যেই নিয়োগ করা হয়েছে সর্দার ও মোড়লদের। তারা এক দিকে কারিগরদের কাজের তাড়া দেয়, আবার শ্রমিক অসন্তোষ দমনেরও চেষ্টা করে। একটি দৃশ্যে আছে :

নন্দিনী। আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে !

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।[১৬৯]

খ) করাতী, খোদাইকর এবং কারিগরদের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা সহজেই অনুমেয়।

গ) আপন মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমিক পশুসুলভ কাজেই যেন বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। [১৭০] তাই ছুটির সময় সে নিজেকে নেশার মাধ্যমে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়। ফাগুলালের কথায় তা স্পষ্ট :

---

১৬৭. এ.এফ. ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব , ঢাকা ১৯৯৩ , পৃ. ১৪৭।

১৬৮.'শ্রমিক যখন কাজ করে তখন সে পরাধীন কিন্তু যখন সে কাজ করে না তখন সে মুক্ত বা স্বাধীন'। ঐ , পৃ. ১৫১।

১৬৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৮৬

১৭০. 'In consequence, man (the worker) feels himself , acting freely in his animal functions like eating , drinking and begetting.....whereas in his human functions he is nothing but an animal'. H. Marcuse , Reason and Revolution , 1947. উদ্ধৃত. এ. এফ. ইমাম আলি, পূর্বোক্ত ,পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ও কী কথা ! সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন । ... ... [১৭১]

যক্ষপুরীর কর্তৃপক্ষও শ্রমিকদের মানবিক সত্তা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই তাদের নির্দেশ করে নামের বদলে সংখ্যা দিয়ে :

বিশু। ... ... ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগু ভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা ?

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে , আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে। [১৭২]

পাঁচ. রক্তকরবী নাটকে শ্রমিক শোষণ ও অত্যাচার-চিত্রের পাশাপাশি শ্রমিক বিদ্রোহের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। এখানে আছে একক এবং যৌথ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ক্ষোভ-ঘৃণা, বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থান চিত্র। ফাগুলাল, বিশু, গজ্জু পালোয়ানদের মধ্যে প্রতিবাদ প্রতিরোধের উত্তাপ আছে। ভণ্ড গোঁসাইয়ের মুখে নাম কীর্তন শুনে ফাগুলাল বলে :

এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার , এতবড় অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামী সইব না। [১৭৩]

আধমরা গজ্জু পালোয়নের উক্তিতে ক্ষোভ , ঘৃণা ও প্রতিহিংসা একসঙ্গে ঝরে পড়ে :

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে ?

---

১৭১. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

১৭২. ঐ ,পৃ. ৩৬০।

১৭৩. ঐ,পৃ. ৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পালোয়ান। কেবল ঐ সর্দারের ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।[১৭৪]

নাটকের শেষ দিকে শ্রমিকরা যথার্থ অভ্যুত্থানের মতো বন্দীশালা ভেঙে দলে দলে লড়াইয়ে যোগ দেয়। বিশু খবর দেয় :

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে।[১৭৫]

ছয়. এ নাটকে যে ভাবে ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার উন্মোচন করা হয়েছে তা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ নাটকে ধর্ম সরাসরি শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার তথা সেবাদাস হিসেবে উপস্থাপিত। মার্কসবাদীদের মতে, ধর্ম হলো শোষিতকে ভুলিয়ে রাখার অস্ত্র বিশেষ। তার অসহায় অবস্থার অবলম্বন।[১৭৬] এখানেও দেখা যায় কারিগরদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমাবার জন্য সৈন্যের পাশাপাশি গোঁসাইকেও নিয়োগ করা হয়েছে। সে তাদেরকে হরি নাম শোনাবে ; বিনিময়ে কারিগররা প্রণামী দেবে। অর্থাৎ গোঁসাই পোষার ব্যয়ভারও শ্রমিকরা বহন করবে। সর্দার বলছে :

সর্দার। একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্য কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। রোজ সন্ধ্যে বেলায় এরা –

সর্দার। এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন, ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ ? আহা এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে

---

১৭৪. ঐ, পৃ. ৩৬১-৩৬২।

১৭৫. ঐ , পৃ. ৪০০।

১৭৬. 'ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ... আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা । ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম'। মার্কস-এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৭১ , পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

> দেখো যে মুখে নামকীর্তন করি সেই মুখে অন্ন যোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে , মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা ! আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো ; তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ। [১৭৭]

ফৌজের অত্যাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের স্বরূপটিও গোঁসাই স্পষ্ট করে দেয় :

> বাবা দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড় নড় করছে, মূর্ধন্য-ণ রা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মত কান তৈরি হল বলে। তবু আর ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা।[১৭৮]

সৈন্যদের পেছনে থাকে আত্মবিক্রীত কিছু গোঁসাই, পুরোহিত কিংবা মৌলানা যাতে অত্যাচারের প্রতিবাদ কেউ না করে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের পক্ষেও ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের এসব কার্যকলাপ বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিল এদেশেরই একশ্রেণীর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। বন্দিনী বাঙালি নারীদের অত্যাচারীর ভোগ্য হিসেবে বিধান দিতেও সে দিন তারা দ্বিধা করে নি।

পেটোয়া বাহিনীর অত্যাচার এবং তার ন্যায্যতা সম্পর্কে ধর্মীয় উপদেশ প্রলেতারিয়েতকে দেহে-মনে দুর্বল করে দেয়। মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, প্রলেতারিয়েতের জন্যে অন্নের চেয়েও বেশি আবশ্যক তার সাহস, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ। [১৭৯] যক্ষপুরীর প্রশাসনও সৈন্য ও পুরোহিত দিয়ে শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে বশ

---

১৭৭. রবীন্দ্র রচনাবলী , পূর্বোক্ত ,পৃ. ৩৬১-৩৬২।

১৭৮. ঐ, পৃ. ৩৬৩। লক্ষণীয়, সংলাপটি ফাগুলালকে (৪৭ ফ) বলা হলেও অন্ন জোগানো ও নামাবলী তৈরির সূত্রে এটি সমস্ত শ্রমিকের প্রতি উৎসারিত।

১৭৯. মার্কস-এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

চালায়। বিশু বলে :

> চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাই-এর জপমালা তৈরী। [১৮০]

অর্থাৎ, নিপীড়ন এবং হরি নাম কীর্তন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মেঝো সর্দার সেটা পুরোপুরি ফাঁস করে দেয় :

> ... ... ওর যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। [১৮১]

তাই অত্যাচারে গজ্জু পালোয়ান একাধারে আধমরা ও ভরসাহীন হয়ে পড়লে গোঁসাইয়ের সন্তুষ্টি ও নির্মম রসিকতা : 'হরি হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ একটু মিহি হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে, আমাদের নাম কীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।' তবে চূড়ান্ত যুদ্ধে এই ভণ্ডদের স্বরূপ উন্মোচন হতে বাধ্য। জনগণ তাদের নিক্ষেপ করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। 'রক্তকরবী' নাটকে তার কৌতুকপ্রদ চিত্রও আছে। নন্দিনীর কাছে গোঁসাইয়ের ভণ্ডামী ধরা পড়ে গেলে সে গোঁসাইয়ের জপমালা নামাবলি ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয় :

> গোঁসাই। ... ... আঃ ছাড়ো , ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা ! ঐ গেল ছিঁড়ে !
>
> ... ...
>
> গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা –সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ করলে ! আমি চললুম। [১৮২]

বস্তুত , রক্তকরবী নাটকে প্রত্যক্ষ বক্তব্য ছাপিয়ে কাহিনীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। এবং আধুনিক মানুষের কাছে তা-ই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সে সঙ্গে এটাও লক্ষ্যযোগ্য যে, যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সর্বদা হিংসা কিংবা হানাহানি

---

১৮০. ১৬৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৮১. রবীন্দ্র রচনাবলী , ১৫শ খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৯১।

১৮২. ঐ , পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে দূরে রাখতে চাইতেন, তিনিই এ নাটকে কাহিনীর স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি দিতে গিয়ে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানকে আহ্বান জানিয়ে বসেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র সৃষ্টিতে 'রক্তকরবী ' নাটক অভাবনীয় ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম তাঁর একান্ত শিল্পী-সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাহিনীর যে যৌক্তিক পরিণতি সঙ্গত বলে মনে হয় তা নাটকের সমাপ্তিতে পুরোপুরি পাওয়া যায় নি। নাটকে যেভাবে পুঁজিবাদী সভ্যতার নির্মম শ্রম শোষণ, অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখানো হয়েছে তাতে ধারণা করা গিয়েছিল যে, সমাপ্তিতে কারিগর, খোদাইকর ও করাতীরা মিলে একটি সুষ্ঠু মানবিক ও বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে বা সেই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করবে। কিন্তু নাটকের শেষে কবি সবাইকে শুনিয়েছেন ফেলে আসা অতীতের কৃষি-নির্ভর জীবনের জয়গান ('পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ... ...) । [১৮৩] অথচ সে সমাজে ভূ-স্বামীদের অত্যাচার নিপীড়নের ফলে কৃষকের যে করুণ দশা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' , 'রায়তের কথা' ইত্যাদি প্রবন্ধে। দেখা যাচ্ছে, এই পশ্চাৎপদ সমাপ্তি রচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববাদী সামাজিক সত্তার সঙ্গে তাঁর কবি-দার্শনিক সত্তার বিরোধ ঘটিয়েছেন। আর সেই স্ববিরোধিতায় জয়লাভ করেছে তাঁর কবি-সত্তা । [১৮৪]

তা ছাড়া প্রথম থেকে যক্ষপুরীকে যেভাবে উন্মোচন করা হয়েছে তাতে রাজাকে শোষণমূলক এই ব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবে দেখাই সঙ্গত। কিন্তু নাটকে রাজার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, বিবর্তন এবং নন্দিনীর প্রভাবে জালের আবরণ ছিন্ন করে

---

১৮৩. 'রক্তকরবী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সেই কৃষিপল্লী উজাড় হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন :

> 'কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে'। রক্তকরবী, বিশ্বভারতী ,১৩৮৮, পৃ. ১১৭।

১৮৪. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদানের যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে তা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, এখানে রাজা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের একজন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়ার সমান্তরাল একটি চরিত্র। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হলো, বুর্জোয়াদের হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার দখল করা। তাই এই সংগ্রামে বুর্জোয়ারা অংশ নেয় না। অবশ্য চূড়ান্ত শ্রেণী-সংগ্রামের সময় কখনও কখনও শাসক শ্রেণীর একটি ছোট অংশ বিপ্লবী শ্রমিকের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। কিন্তু তারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করে সংগ্রামে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থাৎ তারা হয় শ্রেণীচ্যুত।[১৮৫] বর্তমান নাটকে রাজাকে তত্ত্বগতভাবে সে-রকম অবস্থানে কখনও দেখানো হয় নি বলে সেই সুযোগ এখানে ছিল না । তাই শেষ পর্যন্ত নাটকটি শ্রেণী সমন্বয়ের বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, রাজাকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এনে বিপক্ষে দেখানো হয়েছে সর্দার এবং তাদের আজ্ঞাবহ সৈনিকদের। রাজা নিজেই ফাগুলালকে বলে :

> ... ... তোমাতে আমাতে দু'জনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।
>
> ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।
>
> রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।
>
> ফাগুলাল। সৈন্যরা তোমাকে মানবেনা।
>
> রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।
>
> ... ...
>
> ফাগুলাল। রাজা , শুনতে পাচ্ছ গর্জন ?
>
> রাজা। ঐ-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শীগ্‌গির কী করে সম্ভব হল ? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে, আমাকে বেঁধেছে।[১৮৬]

---

১৮৫. মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, পূর্বোক্ত ,পৃ.৪৩।

১৮৬. রক্তকরবী , পূর্বোক্ত , পৃ.১১০।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে রাজাকে তাঁর পক্ষে সাফাই গাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেন বোঝানো হচ্ছে, রাজা নয়, সর্দার বা প্রশাসন যন্ত্রই যক্ষপুরীর তাবৎ দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী। অথচ আমরা প্রথম থেকে দেখেছি, সর্দার, মোড়ল প্রমুখ মূলত রাজার দালাল হয়েই প্রশাসন চালাচ্ছে। রাজাই এখানকার মালিক পুঁজিপতি, শোষক বুর্জোয়া ; সর্দাররা টাউট বা উপস্বত্বভোগী। সাধারণত বুর্জোয়ারা প্রশাসক হিসেবে তাদেরকেই ব্যবহার করে যারা সুষ্ঠুভাবে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি শোষণে সহায়তা করতে পারবে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিকারী প্রশাসন মালিক নিজের স্বার্থেই রাখে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজাকে বাদ দিয়ে তার আমলাতন্ত্র বা প্রশাসন যন্ত্রকে শ্রমিককের শত্রু হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই। সেটি করার অর্থ শত্রুকে আড়ালে থাকতে সহায়তা করা। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিষয়টি কম বিভ্রান্তিকর নয়। দেখা যাচ্ছে, 'রক্তকরবী' নাটকের কাহিনীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শদগত দর্শন বা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি তার বিরুদ্ধতাও একই সঙ্গে চোখে পড়ে।

একজন রবীন্দ্র জীবনীকার প্রদত্ত একটি তথ্য থেকে অনুমান করা চলে যে, পুঁজিবাদী সভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে এ সময় শিলঙ-এ অবস্থান কালে তিনি বিশদভাবে জানতে পেরেছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ড. মুখোপাধ্যায় তখন আহমেদাবাদের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নিয়ে তদন্ত করে সদ্য বোম্বাই থেকে ফিরেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বিশদভবে কবিকে বলেছিলেন এবং কবি তা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তাঁর অর্থাৎ রাধাকমলের ধারণা, যক্ষপুরী (রক্তকরবী নাটকের প্রথম নামকরণ) নাটকের প্রেরণা কবি সেই অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছিলেন।[১৮৭] সম্ভবত, শুধু মালিক শ্রমিক সম্পর্কই নয়, তাঁর কাছ থেকে কবি বস্তুবাদী তথা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল প্রভৃতি, তিনি পুরোপুরি সঙ্গত বলে মানতে পারেন নি হয়তো।[১৮৮] দ্বিতীয়ত, রাজতন্ত্র, রাজা ইত্যাদি সম্পর্কে কবির ছিল

১৮৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩, পৃ. ২০।

১৮৮. 'কারণ, রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে কমিউনিস্ট রাজনীতির শ্রেণী সংঘর্ষ ও

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকালের একটি অনস্বীকার্য আকর্ষণ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'তাসের দেশ' পর্যন্ত প্রায় সব নাটকে ঋষিবৎ রাজা ত্যাগ, প্রেম ও কল্যাণের প্রতিভূ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১৮৯] তাঁর নাটকের কোন রাজা কখনও প্রজা-বিরূপ হয় না, প্রজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় না । এখানে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং ভিন্ন ঘটনাধারায়ও তিনি রাজাকে কারিগরদের আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর একসময়ের স্বীকৃতি আগে লক্ষ্য করা গেছে।

বলা বাহুল্য , কর্ষণজীবী সমাজ এবং রাজতন্ত্রের আবাস একই সমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ; আর তা হলো সামন্ততন্ত্র। জমিদার সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। তাই জমিদারি পেশায় নিযুক্ত কবি জমিদার উচ্ছেদকারী ব্যবস্থাকে, বর্তমান নাটকে রাজতন্ত্র, সে মুহূর্তে নানা কারণে স্বাগত জানাতে পারেন নি। বোধ করি এ ভাবেই জমিদার রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে ত্যাগ করতে পারেন নি শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি । এ সব কারণে বলা চলে, মানুষের জীবনবোধ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অধ্যাত্মভাবনা ও শিল্পবোধ তার জীবিকা সংগ্রহের আর্থ-সামাজিক উৎসের সঙ্গে যে অজান্তে নিবিড়ভাবে অন্বিত হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প-সৃষ্টি রক্তকরবী নাটক তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১৯০]

অবশ্য, উর্পযুক্ত বিরোধগুলো 'রক্তকরবী' নাটকের কিছু তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা মাত্র। নির্মম শ্রমশোষণ ও অত্যাচারে অর্ধমৃত শ্রমিকদের উপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, শ্রমিকদের প্রতি নন্দিনীর অকৃত্রিম সহানুভূতি, ধর্মীয় ভণ্ডামীর স্বরূপ

রক্তাক্ত বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ বা স্বীকার করা সম্ভব নয়।' নেপাল মজুমদার ,ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

১৮৯. 'His plays have plenty of kings: but they are usually abdicating, or wanting to abdicate , or in the end learn to abdicate - that is, the true kings. .....,' **EDWARD THOMPSON, RABINDRANATH TAGORE**: Poet and Dramatist. London. 1948 '(2nd edn.), p. 212।

১৯০. প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস , 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব' ,অনুষ্টুপ, চতুর্বিংশবর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

উদঘাটন এবং সর্বোপরি শ্রমিকের সংগঠিত বিদ্রোহ চিত্রিত হওয়ায় এ নাটককে গণ চেতনা-মূলক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এটি বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁর প্রথাগত রসবাদী ভক্ত সমালোচকদেরকে এর প্রচ্ছন্ন বক্তব্য খুঁজতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন :

> রক্তকরবী সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি। ... সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায়িত্ব কবির নয়। [১৯১]

শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণী সংঘাতের প্রতিফলনে শিল্প-রসের ব্যাঘাত ঘটে – এই আদর্শপন্থী সমালোচকের অস্তিত্ব সে সময়ের মতো এখনও আছে। তাঁদের কাছে এ নাটকের আবেদন সীমাবদ্ধ বলেই প্রতীয়মান হতে পারে। যেমন, একজন রবীন্দ্র-জীবনীকার নিজেই বলেছেন, 'রক্তকরবী শ্রেণী-সংঘাত, শোষিত ও শোষকের দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রিক বলিয়া ইহারও আবেদন বিশ্বজনীন হইতে পারে নাই'। [১৯২] বস্তুত, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন অধ্যাত্মবাদী দর্শনের রূপকার হিসেবে বিশ্বজনীন হওয়ার চেয়ে নিপীড়িত শ্রমজীবীর মতাদর্শিক সংগ্রামের অংশীদার হয়ে ওঠা অনেক শ্রেয়। এবং একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে শ্রেণীসংগ্রাম ভিত্তিক বহু রচনাই শিল্পসফল হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও তার প্রমাণ মেলে। 'রক্তকরবী'র রাজা শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীতে ভিড়ে গেলেও তিনি যে পরাজিত হয়েছেন, তাঁর শোষণ ব্যবস্থা যে বিধ্বস্ত হয়েছে এটি রবীন্দ্রনাথও আড়াল করেন নি। অনিবার্য বাস্তবতার কারণেই সেটা সম্ভব হয় নি। ফলে সর্বহারামুখী নাট্যকর্ম হিসেবে রক্তকবরীর একটি মূল্য নির্ধারিত হয়েই গেছে।

রথের রশি : ১৯২৩ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রথযাত্রা' নামে একটি নাটিকা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন যে, এর ভাবটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর একটি লেখা থেকে। এর পর লেখাটি নিয়ে কবি খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রায় এক দশক পর, ১৯৩২ সালে, শরৎচন্দ্র

---

১৯১. রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত ,পৃ.১১৮-১১৯।
১৯২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত , পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেই পুরনো নাটিকার কিছু পরিবর্তন করে তার নাম দেন 'রথের রশি' এবং 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে তা সন্নিবিষ্ট করে শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। সে সময় এ নাটক সম্পর্কে তিনি বলেন :

> রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা । মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে , তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। [১৯৩]

এ বক্তব্য কাহিনীতে রূপায়িত করার সময় বলা হয়েছে : রথযাত্রার মেলা বসেছে। পাশের রাস্তায় নর-নারীরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে রথ দেখার আশায়। কিন্তু রথের দেখা নেই। কারণ রথ টানবে যারা তারা শত চেষ্টায়ও রথ একচুল নাড়াতে পারছে না। পথের ওপর বিশাল দড়ি অজগর সাপের মত স্থির হয়ে পড়ে আছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না। এমন দিনে এই অলক্ষুণে কাণ্ড দেখে সবাই অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। সন্ন্যাসী নানা রকম সর্বনাশের ইঙ্গিত দেয়। ভীত নারীরা এসে দড়ির ওপর ঢালতে লাগল ঘি, দুধ আর গঙ্গাজল। পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে, উপবাস করে দড়িদেবতার পূজার আয়োজন শুরু করলো তারা। সেই সঙ্গে চলছে রাস্তা-ঠাকুর আর গর্ত-প্রভুর পূজা। শেষ পর্যন্ত নর্মদাতীরের ছাপান্ন বছরের উপবাসী বাবাজিকে আনা হলো । কিন্তু তিনি হাত দেয়ামাত্র আরও বসে গেল রথের চাকা । নিরুপায় রাজা তাঁর সৈন্যসহ চাইলেন রশি টানতে। রথ নড়ল না একটুও। সৈনিকরা হলো বিস্মিত ও লজ্জিত। ধনপতি তার দলবল নিয়ে এসে জোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু রশিটা হয়ে গেল আরও আড়ষ্ট, আর তাদের হাতও হয়ে পড়ল যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মানে মানে সরে পড়ল তারা।

এমন সময় সংবাদ এলো শূদ্রপাড়ায় ভীষণ গোল বেঁধেছে। তারা নাকি জানতে

---

১৯৩. গ্রন্থপরিচয় , রবীন্দ্র রচনাবলী ,২২শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯।

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছে যে, এবার রথ টানার ভার পড়েছে তাদের ওপর। দলে দলে ছুটে আসতে লাগল তারা। সৈনিক -পুরোহিতরা প্রথমে তাদেরকে রশি ধরতে দিতে চায় না। সৈনিক হয় রক্তচক্ষু, পুরোহিত ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিতে উদ্যত। কিন্তু মন্ত্রীর নির্দেশে শূদ্ররা 'জয় জয় মহাকালের জয়' বলে রশিতে দিল টান । চাকার শব্দে আর্তনাদ করে উঠল আকাশ। ধূলো উড়িয়ে ছুটল রথ। আশ্চর্যের বিষয় , রথ কিন্তু প্রথাগত পথে চলতে লাগল না। কাঁচাপথ ধরে রথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটল ধনপতির ভাণ্ডারের দিকে। শঙ্কিত হয়ে ওঠে ধনপতি। কিছু পরে রথ চলল সৈনিকের অস্ত্রশালার দিকে। হতচকিত সবাই যার যার স্থান সামলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো ।

এ সময় কবি সেখানে এসে পড়লে সবাই এর কারণ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে। সত্যদ্রষ্টা কবি বললেন, পুরোহিত , রাজা বা সৈনিকরা ছিল উঁচু মাথাওয়ালা। তাদের দৃষ্টি ছিল সব সময় রথের চূড়ার দিকে নিবদ্ধ। রথ টানছে যে দড়ি ,তার দিকে ওরা ফিরেও তাকায় নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক বন্ধন তাকেই ওরা এতদিন অস্বীকার করেছে। তাই রশির এই অভিনব আচরণ। শূদ্ররা তাদের আত্মশক্তির যোগ্যতায় আজ রথ টানার অধিকার পেয়েছে। তবে শক্তি ও সংযমের ভারসাম্য না রাখলে আসবে আবার উল্টোরথের পালা। কবির বক্তব্য ও নাট্যকাহিনীর সামঞ্জস্য থাকলেও নাটকীয় সংঘাত এখানে খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। চরিত্রগুলো থেকে গেছে অবিকশিত প্রতিনিধিত্বমূলক। কাহিনীর সুস্পষ্ট পরিণতিও এখানে অনুপস্থিত।[১৯৪] তা সত্ত্বেও, এর

১৯৪.'নাটকীয় লক্ষণ ইহাতে সামান্যই আছে : পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টা হয় নাই কিংবা নাটকীয় পরিণামকেও স্পষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই। সূক্ষ্ম একটি কাহিনীর সূত্রকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মূলগত ভাবটিকে কবিগুরু বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মূলগত ভাবের গুরুত্বেই নাটকটির গৌরব'। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।

'বিরোধ-সংঘাত বা সুনির্দিষ্ট নাটকীয় পরিণাম ইহাতে নাই। পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে একটা ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে মাত্র এবং ইহার অন্তরালে কবি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন একটি তত্ত্বের'। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাববস্তুতে যে প্রগতিমুখী সমাজমানসের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষেও রাজনৈতিকভাবে প্রলেতারিয় বা শ্রমিক শ্রেণীর যে ব্যাপক উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে এ নাটকে। বিশেষত, 'রথযাত্রা' হিসেবে প্রায় দশ বছর পড়ে থাকার পর যখন নাটকটি 'রথের রশি' নামে কবি আবার লিখলেন , তখন বোঝা যায় যে, এর বক্তব্যের সঙ্গে কবির উপলব্ধি নিবিড়ভাবে যুক্ত। কবির মতে, প্রথম যুগে পুরোহিতের মন্ত্রেই রথ চলতো। অর্থাৎ ধারণা করা যায়, তারাই ছিল সমাজের প্রভু বা চালক। ' ...পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ। ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন'।[১৯৫] কিন্তু সে দিন আর নেই। সমাজের ওপর পুরোহিতদের খবরদারি গেছে ঘুচে। তাই মন্ত্রে আর রথ চলছে না। কারণ 'কালের পথ হয়েছে দুর্গম'।[১৯৬] এ দুর্গম অবস্থাকে নিজেদের বশে আনল ক্ষত্রিয়রা। সমাজকে চালিয়েছিল তারা দোর্দণ্ড প্রতাপে। আর তারা যতই যুদ্ধ করেছে, তীর ছুঁড়েছে, অসি চালিয়েছে ; ততই মানুষে মানুষে সম্পর্কের সাঁকো হয়েছে ছিন্ন-ভিন্ন । ফলে তাদেরকে দিয়েও আর রথ চালানো সম্ভব নয়। সৈনিক বলছে, 'স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে একটু ক্যাচ্‌কোচ্‌ও করলে না চাকাটা'।[১৯৭] পরে এল ধনপতি বা পুঁজিপতিরা। পুরো পৃথিবীকে তারা করল পুঁজির বশ। পুরোহিত, সৈনিক সবাইকে নিজেদের অনুগত করল তারা। তাদের বাণিজ্যের হাত ছড়িয়ে পড়ল হাট থেকে হাটে, ঘাট থেকে ঘাটে, দেশ থেকে দেশান্তরে। বিজ্ঞানবলে তাদের মুঠোয় এল স্থল জল আকাশের সীমা। কিন্তু ধনপতিরা মানুষে মানুষে ভেদ করল আরও বেশি , সম্পর্কের রশি বলতে রইল না কিছু। তাই তাদের হাতেও রথ চলল না। এল শূদ্রের দল তথা চিরকালের বঞ্চিত, নির্যাতিত, শোষিত শ্রেণীর দল। ওরা হাত লাগাতেই রথ চলল বেগে। কারণ প্রলেতারিয়েতই পৃথিবীতে সৃষ্টি করবে সম-অধিকারের দিন, আনবে সাম্য। উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ তখন আর থাকবে না , থাকবে না অন্যায় অত্যাচার পীড়ন। রাজা-পুরোহিত-ধনপতি-শূদ্র সবাই দাঁড়াবে একই শ্রেণীতে, একসাথে টানবে সভ্যতার রথ।

১৯৫. রবীন্দ্র রচনাবলী , ২২শ খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৯৬. ঐ , পৃ. ১২৩।

১৯৭. ঐ , পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, এ নাটক প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে কবি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ঘুরে এসেছিলেন। সেখানে দেখেছিলেন শূদ্রের রাজত্বের মহত্তর নিদর্শনগুলো। তাই শূদ্র তথা সর্বহারাদের অধিকার ঘোষণা করার জন্য তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। সেজন্য 'রথের রশি'তে রূপকের আড়াল নেই বললেই চলে। রথ যদি হয় কালের গতি, তাহলে শূদ্র বা প্রলেতারিয়েত হল তার চালক। আর শূদ্রের হাতেই যুগের অগ্রগামিতার নিশ্চয়তা। তারাই বর্তমানে যুগস্রষ্টা। যে কথাটি কবি 'রক্তকরবী'তে স্পষ্ট তুলে ধরতে পারেন নি, তাই যেন এখানে উপস্থাপন করলেন তিনি। রথযাত্রার প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পর্যায়সমূহের মিল না থাকলেও পুঁজিবাদ এবং প্রলেতারিয় শ্রেণীর আবির্ভাবে পুঁজিবাদের ধ্বংসের তত্ত্ব বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। এমন কি বাণিজ্য পুঁজি যে এক সময় সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে তা-ও অল্প আয়াসেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

দ্বিতীয় ধনিক। ... আজকাল চলছে যা কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে ।

প্রথম সৈনিক। সত্যি নাকি ! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক। তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে ?

প্রথম সৈনিক। চুপ দুর্বিনীত !

দ্বিতীয় ধনিক। চুপ করব আমরা বটে। আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক। মনে আছে, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক। ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর-এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে। [১৯৮]

এ কথা একটি প্রবন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন :

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে। [১৯৯]

---

১৯৮. ঐ, পৃ. ১২৮।

১৯৯.'লড়াইয়ের মূল',কালান্তর,রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী,১৩৯৩,পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আর শূদ্রদের প্রতীকে তিনি মূলত সমস্ত প্রলেতারিয়েতকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

(শূদ্র) দলপতি। আমরাইতো জোগাই অন্ন তাই তোমরা বাঁচ –
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লাজরক্ষা।[২০০]

প্রলেতারিয় শ্রেণীর উত্থান যে সহজে কেউ মেনে নিতে চায় না, তারও উদাহরণ আছে এখানে। যেমন , সৈনিক বলছে :

সৈনিক। সর্বনাশ ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা – তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক। আজ ধরেছে উল্টো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।[২০১]

রথ চললে শূদ্রদের আক্রমণ করে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত নয় সৈনিকেরা :

সৈনিক। ঠাকুর তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ চলা। ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে, ঢালব ওদের রক্ত।[২০২]

বোঝা যায়, বর্তমান যুগ শূদ্রদের বা প্রলেতারিয়েতের হলেও সে অধিকার আদায়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। রক্তাক্ত ও হিংস্র শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য । রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে'।[২০৩] অবশ্য নাট্যকাহিনীতে সেই চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব নাট্যক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় নি। তা ছাড়া যে ভাবে পুরোহিত থেকে সৈনিক রাজাদের ক্ষমতা দখল এবং তাদের কাছ থেকে ধনপতি বা বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ দেখানো হয়েছে তাতে কিছুটা সরলীকরণের আভাস পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুত, ইতিহাসের এই ক্রমবিবর্তন একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় নি। এ জন্যে প্রত্যেক অগ্রগামী শক্তিকেই অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে । এ লড়াই হয়েছে কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে। 'প্রতিবার এ সংগ্রাম তথা লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের

২০০. রথের রশি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, পৃ.১৩৭।

২০১. ঐ, পৃ. ১৩৭।

২০২. ঐ ।

২০৩. 'লড়াইয়ের মূল' ,কালান্তর, পূর্বোক্ত , পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।[২০৪] বিভিন্ন পর্যায়ের এ সব সংগ্রামের প্রতিফলন এ নাটকে উপস্থাপিত হয় নি। আবার শূদ্রের হাতে বর্তমান যুগ চালানোর ক্ষমতা দিলেও তাদের ওপর নিরঙ্কুশ আস্থার বিষয়টি থেকেছে দোদুল্যমান। শূদ্রদের বুদ্ধির প্রতি তাই পুরোহিতের সংশয় প্রকাশ :

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান –
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি সেই সংশয়কে স্থির বিশ্বাসে সমর্থন দিয়ে বলে :

পারবে না হয়তো ।
একদিন ওরা ভাববে , রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে –
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা –
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে। [২০৫]

চিরকালের অবহেলিত, শোষিত-লাঞ্ছিত প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় গিয়ে যে শোষণমূলক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রাখতে পারে না – এ প্রত্যয় কবি বা নাট্যকারের নেই। তাঁর মনে হয়েছে, ক্ষমতা পেয়ে ওরাও শোষকই হয়ে যাবে ; সমাজে আবার দেখা দেবে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ, সম্পর্কের ফাটল।

কবি বলছে : তারপরে কোন এক যুগে কোন একদিন আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া। [২০৬]

স্মর্তব্য, ১৯২০ সালে তৃতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন :

Of course, Bolshevism is wrong because it is thoroughly selfish. It exploits one class at the expense of all others.

২০৪. মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৩।

২০৫. রথের রশি, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৪২।

২০৬. ঐ , পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

> So selfishness is at the bottom of conflict between the forces of capital and labour. Labour asks for shorter hours and more pay, but proposes to give nothing ; capital asks for more capital, but proposes to give nothing. These conflicting forces of which labour and capital are only two, will wreck the world unless men find a new spiritual faith in which they can all grow together. [২০৭]

অর্থাৎ , শোষিতের প্রতি কবির সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁদের দর্শনের প্রতি, রাজনীতির প্রতি তাঁর এক ধরনের উদাসীনতা বরাবরই ছিল। বোধ করি, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও গতি-পরিণতি গ্রহণ করার বিষয়েও ছিল তাঁর সংশয়। এ সব কারণে তীব্র মানবিকতাবোধে উজ্জীবিত হয়েও শূদ্রদের প্রতি, 'labour'-দের ওপর তিনি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন নি।

অবশ্য, 'রথের রশি' নাটকের মূল ভাববস্তুর ব্যঞ্জনা, কবির এই দোদুল্যমান অবস্থাকে অনায়াসে অতিক্রম করে গেছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতেই যে বর্তমান সভ্যতার সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কর্তৃত্বেই যে একটি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজ গঠিত হতে পারে – এ আকাঙ্ক্ষাই যেন নাটকে প্রবল হয়ে উঠেছে। নাটকের সমাপ্তিতে সে আভাস পরিস্ফুট :

> আজকের মতো বলো সবাই মিলে –
> যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ;
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে,
> তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।[২০৮]

এ দিক থেকে 'রথের রশি'ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথার্থ রাজনৈতিক নাট্যরচনা।

---

২০৭. New York Herald . (Nov. 1.1920) পত্রিকা থেকে নেপাল মজুমদারের উদ্ধৃতি, ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

২০৮. রথের রশি , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে বাংলা নাটক ছিল মোটামুটিভাবে সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজ সংস্কার চেতনা প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয়ে অচিরেই তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধ-চেতনায় স্থিত হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' , মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'শরৎ-সরোজিনী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা ' ও 'মীর কাসিম' প্রভৃতি নাটক সেই বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাটকেও প্রথম থেকে উক্ত ধারার রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটকে তেমনটি ঘটে নি বললেই চলে। অবশ্য এক পর্যায়ে, 'বিসর্জন' থেকে, প্রায় অবধারিতভাবে তাঁর নাটকে প্রকাশিত হতে থাকে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের মনোভাব। পরবর্তী পর্যায়ে বা রূপক-সাংকেতিক ধারায় সে মনোভাব সচেতন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষত 'মুক্তধারা' , 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশি'তে তার প্রতিফলন অনেকখানি স্পষ্ট। তবে শেষ পর্বের নাটকে সেটি আর তেমনভাবে থাকে নি। সে দিক থেকে বলা চলে, রূপক-সাংকেতিক ধারার নাটকগুলোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য-প্রতিভার বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তাঁর শিল্পদৃষ্টি, নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্ব এবং সামাজিক,ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি প্রকাশিত হয়েছে এ সব নাটকে। তাঁর মতাদর্শিক বক্তব্যসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে কখনও সচেতনভাবে, কখনও ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে। যেমন, 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'অচলায়তনে' রাজনীতির প্রতিফলন অনেকটা পরিমাণে কবির ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটেছে। আবার, 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশিতে' রাজনীতি এসেছে তাঁর ইচ্ছানুসারেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তরুণ বয়স থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনীতির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাতও ঘটে এ সময় – যা তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে এ সময় তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেন তাতে তাঁর সে সময়ের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৯৩৩) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেই জন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি।
>
> ... অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোন এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি – জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।[১]

বস্তুত, তাঁর সৃষ্টিতে রাজনৈতিক বক্তব্যের মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি মৌল প্রবণতা বহুলাংশে ক্রিয়াশীল ছিল। সে বিষয় অনুধাবনের লক্ষ্যে এবং তাঁর নাট্য রচনায় প্রতিফলিত রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়োজনে তাঁর প্রবন্ধগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

সাধারণত, তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনায় আলোড়িত হয়েই রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সব প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসক, ইংরেজ ও ভারতবাসী-সম্পর্ক এবং ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, 'দয়ালু মাংশাসী', 'জুতা ব্যবস্থা' (১৮৮১), 'টাউনহলের তামাশা' (১৮৮৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব। কিন্তু, ১৮৮৯ সালে জমিদারির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার তীব্রতা হ্রাস পায়। বরং ১৮৯০ সালে লেখা 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত হয়েছে ইংরেজ প্রশস্তি ; যেমন, ইংরেজ সরকারের নিঃস্বার্থ উপকারিতায় অবিশ্বাস করা কৃতঘ্নতা, ইংরেজের অন্তরে দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা বিরাজিত , ইংরেজ মহৎ ইত্যাদি। কারও কারও ধারণা , প্রবন্ধটি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অনুরোধে লেখা হয়েছিল।[২] কারণ , পরবর্তী কালে রচিত 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৮৯৩), 'কণ্ঠরোধ' (১৮৯৬), 'অত্যুক্তি'(১৯০২) প্রভৃতি

১.কালান্তর , রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ৪৩৭।

২. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব , কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধেও পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজ বিরোধিতা । অবশ্য এ সবের কোনটিতে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় জনগণকে নগ্নভাবে শোষণের উল্লেখ নেই।[৩] এর পরিবর্তে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'রাজা প্রজা', 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৩) সহ কয়েকটি প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় যে, ইংরেজদের ওপর তাঁর আস্থা আছে, তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁর ধারণা মতে ইংরেজরা প্রশংসাযোগ্য। ইংরেজদের ব্যাপারে তাঁর এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি ইংরেজের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে চেয়েছেন এ দেশের মানুষের আত্মিক স্বাধীনতা। এ লক্ষ্যে 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়' (১৯০৪) ও ' অবস্থা ও ব্যবস্থা' (১৯০৫) প্রবন্ধে তিনি সে কালের সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে পল্লীসমাজ গড়ে তোলা।[৪] বলা বাহুল্য, তাঁর এই আহ্বান ও দৃষ্টিভঙ্গির কড়া সমালোচনা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে। সে কালের বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> সর্ব প্রথম ও সর্বাগ্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্য হিসেবে স্থির না করে জাতির সামাজিক সংস্কার , শিল্প-সম্প্রসারণ ও নৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে অতি উচ্চ মাত্রার অজ্ঞতা ও অন্তঃসারশূন্যতা।[৫]

রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টিভঙ্গি 'নিরাপদ' বলে অভিহিত করেছেন একজন সমালোচক :

৩.Hitendra Mitra,Tagore Without Illusions,Calcutta, 1983,p.177।

৪.'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ... ... স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে - কেহ তাহা কাড়ে নাই কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের আমাদের পল্লীর শিক্ষা,স্বাস্থ্য,পথঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি- যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই, ...। আত্মশক্তি , রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ,১৩৯৩ পৃ. ৫৬৪।

৫. ' to attempt social reform , industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom is the very height of ignorance and futility' . quoted. Hitendra mitra, Ibid, p. 192।

Dhaka University Institutional Repository

It is a safe way to cultivate patriotic feeling without having any danger of being a victim of anger of the British rulers.[৬]

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলে কিছু সময়ের জন্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ আন্দোলন ক্রমে সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নিলে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। কারও কারও ধারণা, ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ হুঁশিয়ারি পেয়েই নিজেকে সংযত করেছিলেন তিনি।[৭] যদিও এ সময় তাঁর রচিত কবিতা ও গানে বিপ্লবীরা খুঁজে পাচ্ছিলেন দেশের জন্য আত্মদানের উদ্দীপনা। শুধু তাই নয়, এর পর তাঁর প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় ইংরেজের সঙ্গে সমন্বয়বাদী চিন্তার ছাপ।[৮] 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৯০৮) প্রবন্ধে বিষয়টি স্পষ্ট করে তিনি বলেন যে, ইংরেজ পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে 'বিধাতার ইচ্ছায়' এ দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্নমুখী জ্ঞানের আদান প্রদান চালাতে হবে এবং এ ভাবেই মিলন হবে পূর্ব ও পশ্চিমের।[৯] অবশ্য শেষ জীবনে তাঁর এ উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটেছিলো যা 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

এটা সহজবোধ্য যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিনিধি বলে

---

৬ Hitendra Mitra , Ibid. p.190 ।

৭. Hitendra Mitra. Ibid. pp.119-120 ।

৮. ' সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

'যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে- এমনকি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে'। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড ,বিশ্বভারতী, ১৩৯৪, পৃ. ৪৮০।

৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড , বিশ্বভারতী, ১৩৯৪, পৃ. ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করে নিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে এ দেশবাসীর সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভূত হয় না। সে সঙ্গে শোষক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শোষিত ভারতবাসীর সংগ্রামের বিষয়টিও চলে যায় বিবেচনার বাইরে। আসলে, বাস্তব রাজনৈতিক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক যে অবস্থান চিহ্নিত হয় তা সেকালের স্বাধীনতাকামী, সন্ত্রাসবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রশংসার ও অনুমোদনযোগ্য বিবেচিত হয় নি। তাঁরা হয়তো তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন ভীরুতা, আপসকামিতা, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে চলমান আন্দোলনের বিরোধিতাও। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ আত্মোন্নতির সঙ্গে পল্লীসমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আগ্রহী হন এবং সে কারণে আজকের বহুনন্দিত অথবা নিন্দিত গ্রামীণ ব্যাংক তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন অত্যন্ত স্বল্পহারে সুদ আদায়ের ব্যবস্থায়। কৃষির উন্নতি, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নয়নসহ নানাবিধ গণকল্যাণমূলক পদক্ষেপও তিনি নিয়েছিলেন । নিরুপদ্রবে জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চাও করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি ঝামেলা ডেকে আনার মতো কোনও কাজ করতে হয়তো আগ্রহী অথবা সাহসী ছিলেন না।

এ সব কারণে তিনি হিংস্র ও সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের বিষয়টি কখনও সমর্থন করেন নি। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা হামলাকে তিনি সুনজরে দেখেন নি, সমর্থন করেন নি গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সহিংস পরিণতি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, সম্মিলিত সাধারণ জনতা সব সময় অহিংস থাকতে পারবে না। এক পক্ষের নিষ্ঠুরতা অপর পক্ষের অহিংস থাকার অন্তরায় এবং সহিংসতা অবশ্যম্ভাবী। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি। কারণ ব্রিটিশ তাঁর কাছে শুধু শাসক নয়, সরকার নয় ; ব্রিটিশ রাজও। তাঁর মতে, 'ইংরাজিতে যাকে স্টেট বলে আমাদের দেশের আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তির আকারে ছিল'।[১০] আর রাজা হলো রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যে মঙ্গলের এবং দেবতার শক্তিস্বরূপ।[১১] তাই তাঁর

১০.'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী , ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬।

১১.'রাজভক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত , পৃ. ৪৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের রাজাও সব সময় ধার্মিক ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, কখনও কখনও দেবতাতুল্য ; যেমন 'ডাকঘরে'র রাজা। এ রকম রাজার সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক সব সময় মধুর ও পবিত্র। সেখানে থাকে না শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। মূলত, এটাই ছিল তাঁর পূর্বাপর দৃষ্টিভঙ্গি । রাজাকে তিনি প্রজার দোসরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। এটা তাঁর এক ধরনের রাষ্ট্রদর্শনও বটে। তাই রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা কোন অবস্থাতেই বিদ্রোহ করে না। 'রাজা' ও 'মুক্তধারা' নাটকে স্পষ্টত রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নি। 'রক্তকরবী' তে শ্রমিক বিদ্রোহের লক্ষ্য হয়েছে রাজা নয়, সর্দাররা।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। জমিদারির সুবাদে পাওয়া তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সে কালে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনের কার্যকর বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবত বেশ কঠিন ছিল। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ একেবারে বুঝতেন না, এমন নয়। বরং দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের তালিকায় [১২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও পরবর্তী সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নানা সূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগেই ব্রিটিশ প্রশাসন পরিকল্পনা নিয়েছিল তাঁকে দিয়ে 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করানোর। এ উপন্যাসে যে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়েছিল তা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।[১৩] আর জমিদার হওয়ার সুবাদেই তাঁকে সবসময় কল্পনা করতে হয়েছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় কৃষক বা প্রজাগোষ্ঠীর কল্যাণ সম্পর্কে, যাঁদের সঙ্গে রাজা বা জমিদারের থাকবে এক সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক। আবার, প্রথম জীবনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মধ্যে যে গণমুখী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তা বিভিন্ন আপোসরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। তারই প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ বা অংশ গ্রহণ থেকে একেবারে বিরত ছিলেন না। কংগ্রেসের একাধিক

১২.চিন্মোহন সেহানবিশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, বিশ্বভারতী, ১৩৯২, পৃ. ১৮।

১৩.অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত , পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন, এমন কি এক পর্যায়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেছেন 'স্যার' উপাধি। তাঁর পক্ষে এটি একটি বড় ধরনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পদক্ষেপ। ১৯৩১ সালে হিজলি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে লক্ষ লোকের সমাবেশে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি। কখনও তিনি জাতীয় আন্দোলনের কৌশল প্রশ্নে বির্তক করেছেন তৎকালীন নেতা গান্ধীর সঙ্গে, কখনও শামিল হয়েছেন আর্ন্তজাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ; প্রবন্ধ লিখেছেন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, অহিংসবাদী হয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তারবার্তা পাঠিয়েছেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। নিজের রাজনৈতিক মত সম্পর্কে খোলাখুলি লিখেছেন 'কালান্তর','রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'(১৯৩৩), 'সভ্যতার সংকট,' (১৯৪১) ইত্যাদি প্রবন্ধে। এ সব লেখায় তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রয়দায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশেষ করে মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে তিনি বাস্তব মতামত প্রকাশ করেন যা ছিলো সে সময় বেশ সাহসিকতারই পরিচায়ক। শেষ জীবনে ব্রিটিশের কাছে দাবি করেছেন পূর্ণ স্বাধীনতার ।

তাঁর এই সমাজ ও রাজনীতি-চেতনা শিল্পদৃষ্টিতেও অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে যার কারণে তিনি রচনা করেন 'অচলায়তন' ও 'চণ্ডালিকা'র মতো বর্ণপ্রথা-বিরোধী নাটক। একই কারণে মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণার নাটক 'ডাকঘরে'ও উচ্চকিত মাত্রায় প্রাধান্য পায় মানবিকতা।

এ ভাবে দেখা যায়, বাল্যকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও কর্মকাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করেছেন এবং উক্ত দ্বিবিধ চেতনাই তাঁর সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই, প্রবন্ধের মত তাঁর নাট্যসাহিত্যেও নেই 'বাঁধাধরা' 'সুস্পষ্ট' বা একপেশে রাজনৈতিক মতের প্রতিফলন।

তবে দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে, তাঁর সব নাটকেই লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ। এমন কি আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব না থাকলেও তা সমকালে প্রচলিত শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের অনুরূপ বলেই ধরে নিতে হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্র-নাটকে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে তিনটি ধারা। এক. রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শ্রেণী ঐতিহ্যভিত্তিক, দুই. উদার মানবিকতাবাদী এবং তিন. সমাজ প্রগতিমূলক রাজনীতি। প্রথম পর্যায়ভুক্ত নাটকগুলো হলো যথাক্রমে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রাণী', 'চিত্রাঙ্গদা , 'গোড়ায় গলদ', 'মালিনী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শারদোৎসব' , 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'ফাল্গুনী' , 'গৃহপ্রবেশ', 'চিরকুমার সভা', 'বাঁশরী' ও 'মালঞ্চ'। দ্বিতীয় ধারার নাটকগুলো হলো 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'শোধবোধ' ও 'মুক্তির উপায়'। তৃতীয় ধারার মধ্যে পড়ে 'অচলায়তন' ও 'চণ্ডালিকা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচেতন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশক নাটকগুলোতেও ঘটেছে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। যেমন, 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূট রাজার সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশের ছায়াপাত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্রিটিশের শাসন-শোষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে এ নাটকে তাঁর শ্রেণী-উদ্ভূত, আপোসকামী , পলায়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়ে গেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের সমাপ্তি অংশে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত থাকলেও এ নাটকের মূল বিষয় ও কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে সমাজ-প্রগতিমূলক বক্তব্য। আবার শিল্পগত ত্রুটিসহ 'রথের রশি' নাটকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-প্রগতিমূলক রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে।

এ ছাড়া কোন কোন নাটকে একই সঙ্গে একাধিক ভাবের মিশ্রণও চোখে পড়ে। যেমন, 'গোড়ায় গলদ' নাটকের মূল বিষয়ে রাজনীতি না থাকলেও উকিল 'নিমাই' চরিত্রের মাধ্যমে ধনবাদী সমাজের অর্থসর্বস্বতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তেমনি, উদার মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নাটক 'চণ্ডালিকা' এবং ধর্মসংস্কারমূলক নাটক 'অচলায়তনে' নিম্নশ্রেণীর মানুষকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাতে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতিরই জয়গান সূচিত হয়। বিশেষ করে 'অচলায়তনে' নিম্নশ্রেণীর সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আছে রক্তাক্ত বিপ্লবের উপাদান।

এ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে রাজনীতির স্ব-বিরোধিতামূলক বিভিন্ন ধারার প্রকাশ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, এটি ঘটেছে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীতে অবস্থান করেও তাঁর মধ্যে শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিকতার ফলে। কারণ, সমাজের সচেতন সত্তা হিসেবে তিনি সমাজ-অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেছেন অনেক খানি এবং তাঁর একাধিক নাটকে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশও করেছেন। আবার কয়েকটি নাটকে তা প্রতিফলিত হয়েছে যেন নিজেরই অজান্তে। এ ভাবে তাঁর চিন্তায় যতটুকু গণমুখী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রকাশমাত্রই অনেকাংশে তাঁরই শ্রেণীশাসিত রাজনীতির সঙ্গে যেন বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সব নাটকে কেবল ভাববাদ-নির্ভর দার্শনিকতা-উদ্ভূত শ্রেণীবৈষম্যমূলক রাজনীতির প্রকাশ থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু বেশ কয়েকটি নাটকে এর বিপরীতধর্মী সমাজ-প্রগতিমূলক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কলা-কৈবল্যবাদী , ভাববাদী এবং রস ও সৌন্দর্যের পূজারী নন, একই সঙ্গে বহুলাংশে তিনি সমাজ সচেতন মানবতাবাদী ও গণদরদী। এখানেই নাট্যকার হিসেবে, শিল্পী হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে তাঁর উচ্চতা। এ প্রসঙ্গে সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> মিউনিসিপাল গেজেটে ভ্যানগার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্প্যানিশ যোদ্ধা প্রশ্ন করছেন, টেগোর কি সেই জাতীয় লোক যাঁরা সাক্ষাৎভাবে নূতন সমাজ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে না পরলেও আগামীকালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতন মনের জোর ও স্বাধীনতা রাখেন ? নাৎসি-অভ্যুত্থানের পর রলাঁ যেমন লিখেছিলেন ' Working men, here are our hands. We are yours. Humanity is in danger-' জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কোনও কথা বলা সম্ভব ছিল কি না। কিন্তু অশেষ সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও চির জীবন যিনি নূতন নূতন পথে এগিয়ে চলবার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথেও সহায়ক হিসাবে ভাববার যথেষ্ট হেতু আছে।[১৪]

১৪. সুশোভন সরকার, 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ,সম্পা. বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং প্রায় নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে না পারলেও ভবিষ্যতকে বুঝবার ও অভিনন্দন জানাবার মতো মনের জোর তাঁর ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ক. গ্রন্থপঞ্জী :

১. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫।

২. অজিত কুমার চক্রবর্তী , রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা , কলকাতা, ১৩৯৫।

৩. অরবিন্দ পোদ্দার , রবীন্দ্র-মানস, কলকাতা, ১৯৬৯।

৪. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব , কলকাতা, ১৯৮৮।

৫. অরবিন্দ পোদ্দার , মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ১৯৮৫।

৬. অরবিন্দ পোদ্দার, মানুষের পার্থিব সম্পদ ও সংস্কৃতি ,কলকাতা, ১৯৯৫।

৭. অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৬৪।

৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২।

৯. আনিসুজ্জামান , সম্পা. রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা, ১৯৮৬।

১০. আবু জাফর, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা , চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

১১. আবু জাফর , সাহিত্যে সমাজ ভাবনা, ঢাকা, ১৯৯৫।

১২. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭।

১৩. আবুল হাসনাত, সম্পা. নানা রবীন্দ্রনাথের মালা, ঢাকা, ১৯৮১।

১৪. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সম্পা. সীমার মাঝে অসীম, ঢাকা, ১৯৮৬।

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১।

১৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯।

১৭. উৎপল দত্ত, জপেন দা জপেন যা, কলকাতা, ১৯৮৪।

১৮. এ.এফ. ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৯৩।

১৯. কাজী আবদুল ওদুদ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৭৬।

২০. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা, ১৩৭৬।

২১. ক্ষুদিরাম দাস, সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

২২. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি (অনু.রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়),কলকাতা, ১৯৮২।

২৩. গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী , ১ম খণ্ড , ২য় খণ্ড,৩য় খণ্ড, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৯।

২৪. চিন্মোহন সেহানবীশ , রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, কলকাতা, ১৩৯২।

২৫. জিয়া হায়দার, নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ ,ঢাকা, ১৯৮১।

২৬. টেরি ঈগলটন, মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা (অনু. নিরঞ্জন গোস্বামী), কলকাতা, ১৩৯৮।

২৭. ধনঞ্জয় দাশ, সম্পা. মার্কসবাদী সাহিত্য বির্তক, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৯।

২৮. নাজমা জেসমিন চৌধুরী , বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৩।

২৯. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা , কলকাতা, ১৩৬৯।

৩০. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৩।

৩১. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা, কলকাতা, ১৯৭৯।

৩২. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, কলকাতা, ১৯৮৮।

৩৩. প্লেখানভ, জি.ভি. শিল্প ও সমাজ (অনু. আফজালুল বাসার) , ঢাকা, ১৯৮৬।

৩৪. বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, কলকাতা , ১৯৮৬।

৩৫. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯০।

৩৬. বিনয় ঘোষ, নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, কলকাতা, ১৯৮১।

৩৭. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ১৯৯৩।

৩৮. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়,সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৮৯।

৩৯. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঢাকা, ১৯৮৩।

৪০. মলিনা রায়, (অনু.) রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ পত্রাবলী, কলকাতা, ১৯৬৭।

৪১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মাইকেল দীনবন্ধু রচনাবলী , কলকাতা, ১৯৮৭।

৪২. মাও সে-তুঙ, চার প্রবন্ধ, পিকিঙ, ১৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার , মস্কো, ১৯৭০।

৪৪. মার্কস-এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৭১।

৪৫. মার্কস-এঙ্গেলস, রচনাবলী ১ম খণ্ড (১ম অংশ) , ১ম খণ্ড (২য় অংশ), ২য় খণ্ড (১ম অংশ), ২য় খণ্ড (২য় অংশ) , মস্কো, ১৯৭১ ।

৪৬. মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা, ১৯৭৬।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড থেকে ২৬শ খণ্ড।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , রক্তকরবী ,কলকাতা, ১৩৮৮।

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালঞ্চ, কলকাতা, ১৯৭৯।

৫০. রজনী পাম দত্ত, আজিকার ভারত, কলকাতা, ১৯৮৩।

৫১. রথীন চক্রবর্তী , (অনু.) রোমাঁ রোলাঁর পিপল্‌স থিয়েটার,কলকাতা, ১৯৮৬।

৫২. রমেশচন্দ্র মজুমদার , বাংলাদেশের ইতিহাস , চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫।

৫৩. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ (সমকালীন প্রতিক্রিয়া), কলকাতা, ১৯৯৫।

৫৪. রেবতী বর্মণ, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬।

৫৫. লেনিন, ভ.ই. ধর্ম প্রসঙ্গে , কলকাতা, ১৯৯৩।

৫৬. শঙ্খ ঘোষ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, কলকাতা, ১৯৮৫।

৫৭. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত , কলকাতা, ১৩৯৩।

৫৮. শিবনাথ শাস্ত্রী , রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, ১৯৭১।

৫৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১।

৬০. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার , কলকাতা, ১৯৮২

৬১. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ঢাকা, ১৯৯৫।

৬২. সরল চট্টোপাধ্যায় , ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০।

৬৩. সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬৪. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্বমীমাংসা, কলকাতা, ১৯৯৪।

৬৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬।

৬৭. সুধাংশু দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯০।

৬৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), কলকাতা, ১৯৮৭।

৬৯. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৮৪।

৭০. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯০।

৭১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩।

৭২. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯৫।

৭৩. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, লেনিনবাদীদের চোখে গান্ধীবাদ, কলকাতা, ১৯৯১।

৭৪. স্ট্যালিন, জোশেফ. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৭।

৭৫. হীরেন ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা, ১৯৮৭।

৭৬. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত), কলকাতা,১৯৮৬।

খ) ইংরেজি গ্রন্থ :

1. A Centenary Volume, Rabindranath Tagore 1861- 1961. Fourth printing , New Delhi, 1992.

2. Aronson, Alex. Rabindranath Through Western Eyes, Calcutta ,1978.

3. Bottomore, Tom. A Dictionary of Marxist Thought, New York, 1985.

4. Dutt, R. Palme. India Today, Calcutta, 1986.

5. Guhathakurta, P. The Bengali Drama : Its Origin and Development, London, 1930.

Dhaka University Institutional Repository

6. Kripalani, Krishna. Rabindranath Tagore: A Biography, Calcutta, 1980.
7. Lenin,V.I., On Literature and Art. Moscow, 1987.
8. Marx : Engels, Selected Works, Moscow, 1970.
9. Marx : Engels. Selected Correspondence (1846-1895). London. 1943.
10. Mitra, Hitendra. Tagore Without Illusions, Calcutta, 1983.
11. Sisir Kumar Das. Ed. The English Writings of Rabindranath Tagore. New Delhi. 1996 .
12. Solomon, Maynard. Marxism and Art, Detroit, 1979.
13. Thompson, Edward. Rabindranath tagore: Poet & Dramatist. 2nd edn. London.1948.
14. Wellek, Rene. and Warren, Austin. Theory of Literature, London, 1963.

গ . প্রবন্ধ ও পত্রিকা :

১. অভীক কুমার দে, 'মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৫।
২. উৎপল দত্ত, 'পিসকাটর : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক', এপিক থিয়েটার , নভেম্বর, ১৯৯৩।
৩. পবিত্র সরকার 'ডাকঘর : নাস্তিকের নিবিড় পাঠ', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২।
৪. প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব', অনুষ্টুপ, চতুর্বিংশ বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯০।
৫. বিষ্ণু বসু, 'পোলিটিক্যাল থিয়েটার কেমন হবে', গ্রুপ থিয়েটার, ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ভবতোষ দত্ত, 'রবীন্দ্রনাটকের পূর্বসূত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'মেকওলে, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ', মুক্তকণ্ঠ সাময়িকী , ১৯ জুন, ১৯৯৮।

৮. সুধী প্রধান, 'রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক,' পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩।

৯. স্বরোচিষ সরকার ,' অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ', সীমার মাঝে অসীম, সম্পা . আবু হেনা মোস্তফা কামাল , ঢাকা, ১৯৮৬।

১০. হীরেন ভট্টাচার্য, 'নাটক ও নাট্য আন্দোলনের সামাজিক দায়িত্ব', মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, সম্পা. শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় , কলকাতা, ১৯৮৪।

১১. পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্র-সংখ্যা, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৪, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৩।

১৩. ঐ, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ২, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৪।

১৪. ঐ, বর্ষ ৩০, বিশেষ সংখ্যা, মাঘ-আষাঢ়, ১৩৯২-১৩৯৩।

১৫. ঐ, নবপর্যায় ১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১।

১৬. মানববিদ্যা বক্তৃতা, ১৯৮৬, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭. রবীন্দ্র বীক্ষা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, সংকলন ১৬, পৌষ, ১৩৯৩।

১৮. The Visvabharati Quarterly. Volume 40. Number 1. 1974-75 .

১৯. Hiren Kumar Sanyal, 'The plays of Rabindranath Tagore', A Centenary Volume : Rabindranath Tagore. 1861–1961. Ibid.

২০. Humayun Kabir. Social and political Ideas of Tagore . Ibid.